মেঘনার মোহনায়

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর



মেঘনার মোহনায়

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

বুলবুল প্রকাশন
৮বি / ১, টেমার লেন, কোলকাতা-৯
বিক্রয়কেন্দ্র : ১৮-এল, টেমার লেন
কোলকাতা-৯

MEGHNER MOHANAYE

[An adventure Story of pirates for juvenile readers]

by Dhirendra Lal Dhar

প্রথম প্রকাশ : নববর্ষ, ১৩৯৪

প্রচ্ছদ : রাহুল মজুমদার

অন্তর্চিত্র : অশোক কুমার ধর

প্রকাশক :

বুলবুল সাহা

৮বি / ১, টেমার লেন

কোলকাতা-৯

মুদ্রাকর :

শ্রীনিশীথ কুমার পাঁজা

দক্ষিণেশ্বরী প্রেস

১২/৫, গোয়াবাগান স্ট্রীট

কোলকাতা-৬

মূল্য : পনেরো টাকা

অগ্রজ

শ্রীজীতেন্দ্রলাল ধর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ইতিহাসের পরিবেশে রচিত কিশোর উপন্যাস মাসিক
কিশোর ভারতীতে ১৩৮৬—৮৭তে প্রকাশিত।

মেঘনার মোহনায়



গোড়ার কথা



সতেরো শতকের গোড়ার কথা।

দিল্লীর বাদশা তখন জাহাঙ্গীর।

বাংলার সুবাদার সেখ ইসমাইল খাঁ।

বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলে সাগরতীর ও নদীর মোহনাগুলির ধারে-কাছে যে সব জনপদ আছে তার উপর ঘনিয়ে এসেছে এক দুর্যোগ। এই দুর্যোগের স্রষ্টা পর্তুগীজ জলদস্যুরা। এদেশের মানুষ এদের নাম দিয়েছে—হার্মাদ।

হার্মাদরা ডাকাত। দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী এবং নিষ্ঠুর। ওরা রাত্রির অন্ধকারে জাহাজে আসে, সুপ্ত জনপদের উপর কামান দাগে; তারপর খোলা তলোয়ার হাতে নেমে আসে ঘাটে।

গাঁয়ের মানুষ সচকিত হয়ে ওঠে কিন্তু প্রস্তুত হবার বা পালাবার অবকাশ পায় না। গোলা ফেটে তখন কোন কোন চালাঘরে আগুন ধরে গেছে। সেই আলোয় হার্মাদরা হৈহৈ করে লুঠ করতে শুরু করে দেয়। ওদের কারও কারও হাতে মশালও থাকে।

বয়স্কদের তারা মারধোর করে। জোয়ান ছেলেমেয়েদের ধরে বেঁধে ফেলে। কারও হাতে সড়কি বা তলোয়ার দেখলে গুলি চালায়। তারপর যা পায় লুঠে নিয়ে, চালাঘরগুলিতে আগুন লাগিয়ে, বন্দী জোয়ানদের নিয়ে জাহাজে ফিরে যায়।

এইসব জোয়ান ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে তারা ইউরোপের বাজারে বিক্রী করে। সেখানে বাঙালী দাসদাসীর চাহিদা খুব বেশী।

বিদায় নেবার আগে তারা জাহাজ থেকে আরো দু-চার বার কামান দেগে যায়। এটা তাদের মজা, লুঠ করার আনন্দ।

সকালে যখন সূর্য ওঠে তখন যতদূর চোখ যায় বোম্বেটে জাহাজের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। দেখা যায় গ্রামের কোন কোন বাড়ী পুড়ছে, পথে মৃতদেহ পড়ে আছে, বাড়ীর দরজায় কেউ হয়তো মার খেয়ে কাতরাচ্ছে, সারা গ্রামে বিষণ্ণ স্তব্ধতা।

বাঙালী এই উদ্দাম নিষ্ঠুর হঠকারিতার প্রতিরোধ করতে পারছে না। বাঙালী শক্তিহীন নয়, বাঙালী ভীরুও নয়। নৌচালনাতেও সারা ভারতে—ভারতের বাইরে সিংহল, সুবর্ণদ্বীপ, শ্যাম ও কম্বোজ অবধি বাঙালীর খ্যাতি আছে। বাঙালী সংগঠন গড়ে তুলতেও জানে। কিন্তু বাঙালীর যথেষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র নেই। সড়কি বল্লম আর তলোয়ার দিয়ে তো কামান-বন্দুক রোখা যায় না। যারা কামান ও বন্দুক ভালভাবে তৈরী করতে পারে, সুবাদার তাদের সবাইকেই নগরে নিয়ে গেছে, নবাবী কামারশালায় কাজ দিয়েছে। এই সব এখন অঞ্চলে আগ্নেয় অস্ত্র তৈরী করার মতো কারিগরও নেই।

সুবাদার ইসমাইল খাঁ শক্ত লোক, হার্মাদদের অনাচারের সব সংবাদই তিনি রাখেন, জলদস্যুদের তিনি দমন করতে চান, কিন্তু পেরে উঠছেন না। কারণ, যথেষ্ট শক্তিশালী নৌবহর তিনি তৈরী করতে পারেন নি, বাদশাহের সেরেস্তা থেকে প্রয়োজনীয় টাকার যোগান পান না। নৌবহর গড়ে তোলার দিকে বাদশাহেরও কোন আগ্রহ নেই। স্থলে লড়াই করার দিকেই তাঁদের নজর বেশী। সেজন্য তাঁরা চতুরঙ্গ সেনা—হস্তী, অশ্ব, গোলন্দাজ ও পদাতিক ফৌজ নিয়েই ব্যস্ত। তাছাড়া বাংলামুল্লুকের উপর তাঁরা প্রসন্ন ছিলেন না। বাংলার বারো ভূঞাদের আচরণ প্রীতিপ্রদ ছিল না। বাদশাহ চাইতেন ওরা কিছুটা বিব্রত হোক না, তারপর কয়েকটা জলদস্যুকে শায়েস্তা করতে বাদশাহী নৌবহরের আর ক'দিন সময় লাগবে?

অথচ সত্যি কথা বলতে কি, সারা হিন্দুস্থানের সমুদ্রসীমা পাহারা

দেবার মতো নৌবহর বাদশাহের ছিল না। সাগরপথে সাম্রাজ্য আক্রান্ত হবার কোন কথাই তাঁরা ভাবতেন না।

পর্তুগীজ হার্মাদরা এই দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়েছিল। গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করতে করতে তাদের দুঃসাহস বেড়ে গিয়েছিল। সুবিধা মতো তারা বাদশাহী জাহাজও আক্রমণ করতো, জাহাজ দখল করে মোগল সৈনিকদের হত্যা করতো, জাহাজ নিয়ে উধাও হয়ে যেতো নিজেদের আস্তানায়। বাংলার সুবাদার কিছুতেই তাঁদের সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না।

কিন্তু ইসমাইল খাঁ হাল ছেড়ে দেবার মানুষ ছিলেন না।

কয়েকমাস চেষ্টা করে সুবাদার বাংলার মাঝিমাল্লা নিয়ে এক শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তুললেন। তারপরই সেই নৌবহর পাঠালেন সন্দীপে।

সন্দীপেই তখন হার্মাদদের ঘাঁটি হয়েছিল।

বাদশাহী নৌবহরকে প্রতিরোধ করলো জলদস্যুর সর্দার ক্যাপ্টেন গনজালিশ।

দুর্দান্ত ও দুঃসাহসী এই মানুষটি কোন বিপদকেই গ্রাহ্য করে না। লড়াই নরহত্যা ও লুণ্ঠনে তার ক্লান্তি নেই। সাত-সমুদ্দুর-তেরো-নদী পার হয়ে সুদূর পর্তুগাল থেকে সে এসেছে হিন্দুস্থানের সম্পদ লুঠতে। সে বেপরোয়া। সে শুধু সোনাই চেনে না, এদেশের মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে সে ইউরোপের বাজারে বেচতে পাঠায়। সে নিষ্করুণ হৃদয়হীন নিষ্ঠুর। যারা তাকে জানে, তারা তার নাম শুনলে ভয় পায়। গনজালিশ তা জানে, তাতেই তার আনন্দ। সে নিজেকে তৈমুরলঙ্গ বা চেঙ্গিজ খাঁর মতো মানুষ বলে ভাবতে আনন্দ পায়।

সাগরের বুকে দুপক্ষের লড়াই হলো।

প্রচণ্ড লড়াই।

পুরো একটা দিন লড়াই হলো। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

বিকালের দিকে বাদশাহী নৌবহরের সেনাপতি পর্তুগীজ গোলার আঘাতে নিহত হলেন। ইতিমধ্যে কয়েকখানি জাহাজও নষ্ট হয়েছে। ঘায়েল জাহাজ থেকে যারা জলে পড়লো, বা নৌকা ধরে বাঁচার চেষ্টা করলো পর্তুগীজরা তাদেরকে গুলি করে হত্যা করলো। শেষ অবধি বাদশাহী বহর পর্তুগীজদের সঙ্গে পেরে উঠলো না।

বাদশাহী বহরের বিশেষ ক্ষতি হলো। তারা পরাজয় মেনে নিয়ে হটে এলো। যতগুলি জাহাজ গিয়েছিল তার অর্ধেকও ফিরলো না। নিহত হলো প্রায় হাজারখানেক বরকন্দাজ।

ক্যাপ্টেন গনজালিশ বিজয়গর্বে সন্দীপে ফিরে গেল। নিজের দলের হতাহত নিয়ে তার কোন মনোবিকার নেই। বিজয়ীর অহঙ্কারে সে ঘোষণা করলো—সে-ই এবার সন্দীপের রাজা—সুলতান গনজালিশ।

এই যুদ্ধের পর আমাদের এই কাহিনীর শুরু।



প্রথম পর্ব

॥ এক ॥



পূর্ব বাংলার সাধারণ একটি গ্রাম গোবিন্দপুর।

সেখানকার সাধারণ এক বামুনের ছেলে বলরাম আচার্য।

জাতে বামুন্ হলেও যজন-যাজন তাদের পেশা নয়। বলরামরা তিনপুরুষের বৈদ্য।

বলরামের ঠাকুরদা মাধব আচার্য কিশোর বয়সে বিষফোঁড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। পিঠের অনেকখানি জায়গা নিয়ে সেই ফোঁড়ার দশটি মুখ হয়েছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় কিশোর অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। সাধারণ চিকিৎসায় কোন উপশম হয় নি, তখন এক চাঁদসী চিকিৎসক তাঁকে আরাম করেন। সেই থেকে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের ওপরেই মাধবের আগ্রহ দেখা যায়। পূজা-অর্চনার চেয়ে অসুস্থকে নিরাময় করাই তিনি বেশী পছন্দ করতেন। সারাজীবন ধরে তিনি বহু বনজ গাছগাছড়ার গুণাগুণ পরীক্ষা করে ভিষগাচার্য হয়েছিলেন। সাপের বিষ নামাতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সেই বিদ্যাটা তিনি ছেলে মুকুন্দকে দিয়ে যান। পরে নাতি বলরাম সেই ধারা রক্ষা করেছে।

বলরামরা যমজ। বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ। বলরাম শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে কয়েক মিনিটের অগ্রজ।

যমজ হলেও দুই ভাইয়ের, মানসিকতা দুই দিকের।

বলরাম ডানপিটে দুরন্ত ও বেপরোয়া। কোন কাজে পিছিয়ে আসার মানুষ সে নয়। শ্রীকৃষ্ণ শান্ত ও চিন্তাশীল।

দু-ভাই বাপের কাছে সাধারণ শিক্ষা শেষ করে আয়ুর্বেদের পাঠ নিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণ পিতার সহকারী হলো। আর বলরাম জলা-জঙ্গলে গাছ-গাছড়ার সন্ধানে ঘুরতে লাগলো—নতুন কোন্ গাছ-পাতার রসে স্থানীয় লোকেরা নতুন কি উপকার পেয়েছে জানতে সচেষ্ট হলো।

সামান্য কয়েকদিনের সান্নিপাতিক জ্বরে মুকুন্দ আচার্যের মৃত্যু ঘটলো। দুই ভাইয়ের বয়স তখন মাত্র বছর কুড়ি। বলরাম বললো —এক বাড়ীতে দুজন বদ্যি কি করবে? তাছাড়া কেষ্টকেই বাবার সহকারী হিসাবে সবাই জানে। এখানে বসে ও-ই কবিরাজী করুক, আমি দিনকতক ঘুরে-ফিরে আসি।

বলরামের এই বাড়ী-ছাড়া ঘোরাফেরার অভ্যাস আগে থেকেই। আগে দু-একদিন এদিকে-ওদিকে ঘুরে আসতো। এখন এক একবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়, পাঁচ-সাত দিন আর ফেরে না। বলে যায় —মা, তুমি আমার জন্য ভেবো না। কেষ্ট তো রয়েছে, আমি কবে ফিরবো কিছু ঠিক নেই।

কাঁধে একটা ঝোলায় কাপড়-গামছা আর কিছু গাছ-গাছড়া নিয়ে, হাতে লাঠি নিয়ে বলরাম বেরিয়ে পড়তো। তখনকার দিনে বাংলাদেশে একটা লোকের খাবার চিন্তা করতে হতো না; বিশেষ করে ব্রাহ্মণসন্তানের। অতিথিসেবা ও ব্রাহ্মণ-সেবা তখন ছিল পুণ্যকর্ম। অতিথি নারায়ণ, তার উপর ব্রাহ্মণ হলে আর কথা কী!

অকারণে বলরাম যে ঘুরতো তা নয়। নতুন গাছ-গাছড়া চেনা এবং তার গুণাগুণ কেউ জানে কিনা খবর নেওয়া—এইটাই ছিল বলরামের প্রধান কাজ। সেই সঙ্গে কাউকে সাপে কেটেছে শুনলেই সেখানে সে ছুটে যেতো ও রোগীর চিকিৎসা করতো।

নতুন লতাপাতার কোন উপকারিতা জানতে পারলেই ভাইকে এসে জানিয়ে চিনিয়ে যেতো। শ্রীকৃষ্ণ সেটা কাজে লাগাতো।

এইভাবেই কাটছিল।

॥ দুই ॥



সেবার বর্ষার শেষে ওই অঞ্চলটায় সাপের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছিল।

একটার পর একটা সাপে-কাটা রোগী দেখতে দেখতে বলরাম এক একখানি গ্রাম ছাড়িয়ে একেবারে সাগরের পারে গিয়ে পৌঁছালো। অবশ্য সাগর বললে একটু বাড়িয়ে বলা হয়। তবে পদ্মার সেই মোহনা সাগরেরই তুল্য।

সেখানে একটা সাপে-কাটা ছেলেকে যখন সে সচেতন করে তুললো, তখন কথায় কথায় শুনলো আগের দিন সাগরের বুকে হার্মাদদের সঙ্গে বাদশাহী নাওয়ারা ফৌজের লড়াই হয়ে গেছে, সন্দীপের কাছে। এখানকার জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে সেই লড়াই দেখে ফিরে এসেছে। লড়াই চলেছিল অনেকক্ষণ। সারা দুপুরেও সে লড়াই থামে নি। দূর থেকে শুধু কামানের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল আর গুম গুম আওয়াজ। তবে শেষ অবধি কে যে জিতেছে, আর কে যে হেরেছে জানা নেই। দু-একদিনের মধ্যেই সে খবরটা জানা যাবে। হার্মাদরা যদি রীতিমত একটা মার খায় তবেই মঙ্গল। আর যদি তারাই জিতে থাকে তাহলে এখানকার মানুষের সর্বনাশ।

সাপের বিষ নামাতে বদ্যিকে পরিশ্রম করতে হয় প্রায় ঘণ্টাখানেক। শীতের দিনেও গায়ে ঘাম দেখা দেয়। বলরাম খানিকক্ষণ বসে বসে জেলেদের কথা শুনলো, তারপর নদীতে গেল স্নান করতে।

স্নান সেরে সূর্য-প্রণাম করে ঘাটে এসে উঠেছে এমন সময় কোমরে তলোয়ার ঝুলানো এক বরকন্দাজ এসে হাজির হলো। এক পাঠান জোয়ান, সুবাদারের ফৌজের লোক বলে মনে হয়। উর্দুতে বললো —এখানে বলরাম বদ্যি নামে কোন হেকিম এসেছে?

বলরাম সামনে গেল, বললো—আমারই নাম বলরাম, আমিই হেকিমি করি।

—আপনাকে একবার যেতে হবে আমার সঙ্গে। আমার বাবার চিকিৎসার জন্যে।

—কি হয়েছে?

—হাতে পায়ে চোট লেগেছে।

—লড়াই করে চোট খেয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—বন্দুকের গুলি না তলোয়ার?

—তলোয়ার।

—আপনারা বাদশাহী ফৌজের লোক?

—হ্যাঁ। আমার বাবা নাওয়ারা মনসবদার, সর্দার মনসুর আলি।

—কাল তো সাগরে লড়াই হয়ে গেছে।

—আমরাই লড়েছি।

—জিতেছেন?

—না। হেরে গেছি। আমাদের বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। অনেক খুন-জখম হয়েছে। আপনি জল্‌দি চলুন।

—চল, আমি এখন যাচ্ছি।

স্নানের পর কিছু না খেলে বলরামের চলে না। গৃহস্থের কাছ থেকে এক চুপড়ি মুড়ি ও বাতাসা নিয়ে, ঝোলা কাঁধে ঝুলিয়ে, লাঠি বগলে নিয়ে বলরাম তখনই পাঠান যুবকের সঙ্গে রওনা হয়ে গেল। বললো—খেতে খেতেই পথ চলবো, সময়টা নষ্ট হবে না।



॥ তিন ॥

গ্রামের শেষে নদীর ধারে জেলেপাড়া।

পরপর জেলেদের মেটে ঘর, গোলপাতায় ছাওয়া।

বর্ষার দিনে জলঝড়ে এইসব ঘরের চাল প্রায়ই উড়ে যায়। আবার নতুন করে ছাইতে হয়। এক এক বর্ষায় দুবার-তিনবার এই কর্ম করতে হয় এখানকার সবাইকেই। এখানকার মানুষ জলঝড়ের ও দুর্যোগের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে বাস করে, অথবা বাস করতে বাধ্য হয়। জীবিকার জন্য তাদের এইভাবেই থাকতে হয়। মাছ ধরা তাদের জীবিকা। নদীর কিনারে থাকাই তাদের সুবিধা।

সেখানকার এক ঘরে পাঠান যুবক বলরামকে নিয়ে এলো। সামনের দাওয়ার উপর একখানি চাটাইয়ে সর্দার পড়ে আছে। চেতনা আছে বলে মনে হয় না। কাঁধে, হাতে, পায়ে পট্টি বাঁধা।

বলরাম ধমনীর গতি পরীক্ষা করলো। প্রচুর রক্তপাতে সর্দার দুর্বল হয়ে পড়েছে। বললো—কাঁচা দুধ চাই, আগে একটা ওষুধ খাওয়াবো। তারপর চাই গরম জল। ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ওষুধ লাগাতে হবে।

জেলেরা অনেকেই দাঁড়িয়েছিল সেখানে, বললো—আমাদের কারও তো গরু নেই। আর এই সময় কাঁচা দুধই বা পাবো কোথায়?

বলরাম বললো—অভাবে গরম জল দাও।

জল গরম করার ব্যবস্থা হলো। বলরাম ঝুলি থেকে খল বের করলো, মধুর শিশি বের করলো, বের করলো ওষুধের পুরিয়া। ষড়্গুণবলিজাড়িত মকরধ্বজ মধু দিয়ে মাড়তে শুরু করে দিল।

পাঠান সর্দার আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেও চেতনা হারায় নি। মকরধ্বজ খাইয়ে, কয়েক চুমুক গরম জল খাইয়ে দেওয়া কঠিন হলো না।

এবার বলরাম ঝোলা থেকে একগাদা পাথরকুচি পাতা ও গাঁদা-পাতা বের করে ছেঁচতে বসলো। এই টাটকা পাতাগুলি প্রতিদিন পথ চলতে চলতে সে সংগ্রহ করে।

এবার সর্দারের দেহের ক্ষতস্থানের এক একটি পটি খুলে, ক্ষতস্থান গরম জলে পরিষ্কার করে নিয়ে বলরাম সেখানে সেই পাতার প্রলেপ লাগাতে শুরু করলো।

হাতে দুটি ও পায়ে একটি পটি বাঁধতেই বলরামের প্রায় একঘন্টা সময় লেগে গেল।

ইতিমধ্যে মকরধ্বজের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ধমনীর গতি কিছুটা জোরালো হয়েছে। বলরাম বললো—আর ভয় নেই, দিন তিনেক শুয়ে বসে থাকলেই শরীরটা অনেকটা ঠিক হয়ে যাবে।

সর্দার ক্ষীণ কণ্ঠে বললো—কিন্তু আমার যে একবার ঢাকায় যাওয়া জরুরী দরকার।

বলরাম বললো—শরীরে না কুলালে কি করে যাবেন? অন্ততঃ দুটো দিন চুপচাপ শুয়ে থাকুন, তারপর পাল্‌কি করে যেতে পারবেন। এখন যাওয়া চলবে না, আঘাতের জায়গাগুলো আগে কিছুটা সুস্থির হোক। নইলে তো আবার রক্তপাত শুরু হবে তখন ঘাটে-মাঠেতো করার কিছু থাকবে না।

—তবে তাই হোক্। —বলে সর্দার চোখ বুজলো।

এবার এক বৃদ্ধ জেলে বললো—দাদাঠাকুর, আপনার সেবা হয়েছে? সকাল থেকেই তো চিকিচ্ছে করছেন বলে শুনছি। এদিকে তো সন্ধ্যে হয়ে এলো।

বলরাম হেসে বললো—আসার পথে মুড়ি বাতাসা খেয়েছি।

—সারাদিন পেটে অন্ন পড়েনি, এখানে তাহলে আমরা স্বপাকের ব্যবস্থা করি।

—না। রান্না-বান্নার ঝামেলা করতে আর ইচ্ছে করছে না।

—তাহলে চিঁড়ে-গুড়······?

—না। দুধ, মর্তমান কলা ছাড়া ফলার জমবে না। দুধ তো তোমাদের নেই। আর কলাই বা কার কাছে চাইতে যাবে। তার চেয়ে মুড়ি বাতাসা দাও, তাতেই হবে। দু-চারদিন ভাত না খেলেও আমার অসুবিধা হয় না; অভ্যাস আছে।

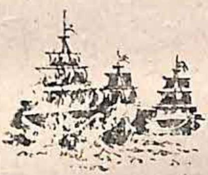
—তাহলে নদী থেকে এক ঘটি জল নিয়ে এসে আপনি বসুন, আমাদের জল তো দেওয়া চলবে না।

—বেশ তো, একটা ঘটি দাও, নদী থেকে ঘুরে আসি।

ঘটি হাতে বলরাম নদীর ঘাটে চলে গেল।

এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

তখনকার দিনে বড় গৃহস্থ রেড়ির তেলের আলো জ্বালাতো, গরীবরা জ্বালাতো সজ্‌নে তেলের পিদিম। তা-ও অল্প সময়ের জন্য। ঘরে সন্ধ্যা দেখিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারতে যে সময়টুকু লাগে। আর জোরালো আলোর দরকার হলে খড়ের মশাল জ্বালতো। বলরামের আলোর কোন প্রয়োজনই ছিল না। এক ধামা মুড়ি আর প্রায় পঁচিশ গণ্ডা বাতাসা শেষ করে, এক ঘটি জল গলায় ঢেলে, পাঠান-সর্দারকে একবার দেখে নিয়ে সে পাশের ঘরের দাওয়ার একপাশে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। মশার উপদ্রব কিছু আছে, তবে নদীর ঝড়ো হাওয়ায় তেমন সুবিধা পাচ্ছে না। ঝোলা থেকে একখানা উত্তরীয় বের করে বলরাম আপাদমস্তক ঢেকে নিলে। সারাদিনের ক্লান্তি· অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়লো।



॥ চার ॥

গ্রামবাসী বামুনের ছেলে, উষার আলো ফুটে ওঠার আগেই ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করা আবাল্যের অভ্যাস। রাত্রিশেষে বলরাম এক আকাশ তারার পানে চোখ মেললো। কয়েক মিনিট চুপ করে সে পড়ে রইল, নদী তীরের স্নিগ্ধ বাতাস মায়ের স্নেহকোমল স্পর্শের মতো লাগছে। বড় ভাল লাগছে।

সহসা ও কিসের শব্দ ?

বলরাম চমকে উঠে মুখ ফেরালো। স্বপ্ন দেখছে নাকি ?

সারি সারি নৌকা থেকে হার্মাদরা ঘাটে উঠছে। মাথায় কালো-কালো নৌকার মতো টুপি।

বলরাম ধড়মড় করে উঠে পড়লো। দু'পা গিয়ে পাশের দাওয়ায় ঘুমন্ত পাঠান যুবককে মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে চাপা কণ্ঠে ডাকলো—আলি সাহেব; জলদি উঠে পড়ো—

মনসুর সর্দারের ছেলে চমকে, ধড়মড় করে উঠে বসলো। বললো —কি হয়েছে ?

—হার্মাদরা এসে পড়েছে।

—কই ? কোথায় ?

বলরাম আর কিছু বলার আগেই চারপাঁচ জন হার্মাদ বন্দুক বাগিয়ে ধরে সেইদিকে এগিয়ে এলো।

বলার আর কিছু নেই, করারও আর কিছু নেই।

হার্মাদরা সামনে এলো।

একজন হার্মাদ ভাঙাভাঙা বাংলায় জিজ্ঞাসা করলো— তোমরা কে ?

বলরাম জবাব দিল—আমি বদ্যি, রোগীর চিকিৎসা করি।

আরেকজন হার্মাদ আলির পানে তাকিয়ে বললো—এরা তো দেখছি মোগল ফৌজ। এই হারামজাদা তো লড়াই করে চোট খেয়ে পড়ে আছে—

আরেকজন বললো – দুটোকেই এখানে শেষ কর,—

—না না, জোয়ানটাকে মারিস্ না, রোমের বাজারে ভাল দামে বিক্রী হবে। বুড়ো দুষমনটাকে শেষ কর—বলে সে নিজেই ক্রম করে গুলি চালিয়ে দিল।

একেবারে বুকের উপর বন্দুক ধরে গুলি। আহত সর্দার মনসুর আলি একবার কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল।

ছেলে ইয়াকুব আলি তলোয়ারে হাত দিয়েছিল, কিন্তু কিছু করার আগেই হার্মাদরা তাকে ও বলরামকে চেপে ধরলো।

বলরামের কোমরে ছিল গামছা, ইয়াকুবের ছিল দামাস্কাসী রুমাল, তাই দিয়েই তারা দুজনের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো। তারপর একজন তাদেরকে নিয়ে গেল ঘাটের সামনে

অশত্থ গাছটার নীচে, বললো—চুপ করে বসে থাক, কেউ একটা কথা বললেই মার দেবো।

তারপর সমস্ত জেলেপাড়া জুড়ে চললো দুরন্ত হার্মাদদের তাণ্ডব অভিযান।

কতজন বন্দুকের গুঁতো খেয়ে শুয়ে পড়লো।

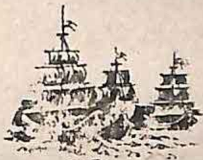
কতজন জোয়ান ছেলেমেয়েকে ধরে আনা হলো সেই গাছতলায়।

তারপর সেই গোলপাতার ঘরগুলির চালায় হার্মাদরা আগুন লাগিয়ে দিল।

ঘাটে তো নৌকো ছিল, সবাইকে নৌকোয় তুলে নিয়ে হার্মাদরা জাহাজে ফিরলো।

সেদিন সূর্যোদয়ের ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই শান্তিময় একটা পল্লী অগ্নি ও আর্তনাদে মর্মন্তুদ হয়ে উঠলো।

॥ পাঁচ ॥



বেলা দ্বিপ্রহরে জাহাজ এসে লাগলো সন্দীপে।

মলিন মুখ শুষ্ক কণ্ঠ বন্দীর দল জাহাজ থেকে নামলো।

সমস্ত দলটিকে হাজির করে দেওয়া হলো ক্যাপটেন গনজালিশের সামনে। ক্যাপটেন তখন একখানি বাড়ীর বাতায় বসে খাওয়া-দাওয়া করছিল, বন্দীদের পানে একবার তাকিয়ে যেন খুসি হলো, বললো—ঠিক হ্যায়, ক্যাপ্‌টেন ডিস্থুজার কাছে নিয়ে যাও। এরা এখন মাটি কাটবে, আরো অনেক কাজ আছে, সব করবে।

গনজালিশ এখন সন্দীপে বোম্বেটেদের শক্ত ঘাঁটি বানাতে চায়। জলের কিনারা ধরে চওড়া জাঙ্গাল বাঁধছে। মাটি কেটে দশ হাত চওড়া একটা দেয়াল দেবার চেষ্টা চলছে। সেই দেয়ালের উপর কামান বসানো হবে, ঘোড় সওয়ার ছুটবে। বোম্বেটেরা যত

মানুষকে ধরে এনেছে, সবাইকে এই কাজে লাগিয়েছে। জোয়ান ছেলেরা যেখানে যত ঢিবি দেখছে কেটে সমান করছে, আর জোয়ান মেয়েরা সেই মাটি ঝুড়ি ঝুড়ি মাথায় করে এনে ফেলছে, জল দিয়ে তারই দেয়াল জমানো হচ্ছে।

সব কাজ করানো হচ্ছে ধরে-আনা মানুষগুলিকে দিয়ে।

এদের খাটাচ্ছে ডিস্যুজা।

ডিস্যুজা লম্বা চওড়ায় এক মস্ত জোয়ান। হাতে একটা বেতের ছড়ি নিয়ে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। কাউকে একটু থামতে দেখলে, কি একটা কথা বলেছে শুনলে তার উপর সপাং করে এক ঘা বেত বসিয়ে দেয়। তার বেত মারার কায়দাটা আবার পিঠের উপর নয়, মুখের উপর। নির্মম মার। যে মার খায় তার মুখের উপর কালসিটের দাগটা অনেক দিন থাকে আর— সকলের নজরে পড়ে। কয়েকজনের একটা করে চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। সেজন্য ডিস্যুজার কোন মানসিক চাঞ্চল্য হয় নি।

ডিস্যুজা মুখের পানে তাকালেই বন্দী ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ডিস্যুজা সারাদিন ধরে নেশা করে, চোখদুটি সব সময় লাল।

বলরাম ও ইয়াকুবকে ডিস্যুজা মাটি কাটতে দিল।



॥ ছয় ॥

ইয়াকুব খন্তা দিয়ে মাটি কোপায়, বলরাম কোদাল দিয়ে সেই মাটি তুলে ঝুড়ি ভরে। তারপর সেই ঝুড়ি তুলে দেয় আর একজনের মাথায়, সে জাঙ্গালের ধারে ফেলে আসে। একজন বালতি করে জল নিয়ে এসে ঢালে, অন্যজন সেই মাটি মেখে পাঁচিলের সঙ্গে মেলায়। এইভাবেই কাজ চলতে থাকে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি একটানা কাজ। অবসর নেই, বিশ্রাম নেই।

দুপুরের দিকে ঠেলাগাড়ীতে করে মালসা-মালসা ভাত আসে, আর শাকসব্জি। বন্দীদের খোরাক। মাথাপিছু এক এক মালসা ফেনশুদ্ধ ভাত, শাকসিদ্ধ আর নুন। পিছনে একটা জলা আছে, সেখানে হাত পা ধোয়া, আঁচানো ও জলখাওয়ার ব্যবস্থা। এঁটো মালসাটাও সেই জলে ধুয়ে দিতে হয়।

সন্ধ্যা অবধি স্নান করার কোন অবকাশ নেই।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে কাজ বন্ধ হয়। তখন আবার সেই মালসাভোগ। আহার শেষে ইচ্ছা করলে তুমি জলায় গিয়ে স্নান করতে পার। নদীর দিকে যাবার হুকুম নেই।

তারপর সারারাত পড়ে থাকো খোলা মাঠে, মশার কামড় খাও। ঘুমুতে না পার, বসে থাকো।

এ-জীবন সাত দিন চালানো কঠিন।

ইয়াকুব আর বলরাম পাশাপাশি শুয়ে থাকে। এক আকাশ তারার পানে তাকিয়ে কত কি ভাবে।

একসময় ইয়াকুব বলে—হেকিম সাহেব, ডিসুজা ফিরিঙ্গিটাকে আমি খুন করবো। ও ব্যাটা আমার বাপকে খুন করেছে, আমি তার শোধ নেবো।

বলরাম বললো—খবরদার, এখন ও কাজ করো না। ওরা তাহলে আমাদের সবাইকে ধরে ধরে কোতল করবে। একটা মানুষের খুনের বদলা নিতে গিয়ে এতোগুলো মানুষ খুন হবে। এখন এ কাজ ঠিক হবে না। আমাদের শাস্ত্রে আছে—অশুভস্য কালহরণং—খারাপ কাজে অনেক ভেবেচিন্তে এগোতে হয়।

ইয়াকুব গজগজ করে ওঠে—তোমরা এইসব সেকেলে শাস্ত্র মেনে চলো বলেই তো আজ তোমাদের এই দেশে আমরা রাজা হয়েছি।

বলরাম বললো—বিপদে ধৈর্য ধরো, সুযোগ আসবেই।

ইয়াকুব বললে—আমার অতো ধৈর্য নেই। আমি সুবিধা পেলেই ব্যাটাকে খুন করবো। যা হয় হোক্।

বলরাম বললো—সে এখন নয়, আমি ঠিক সময় তোমাকে বলে দেবো।

—তুমি বিদ্যি, তায় আবার হিন্দু বামুন, তুমি খুনোখুনি ভয় কর। আমরা পাঠান-বাচ্চা, জানের মায়া রাখি না। জান নেবো, জান দেবো। কিসের পরোয়া! শয়তানকে বেশী দিন সইতে নেই।

—ক'দিন অপেক্ষা কর, আমার কথা শোনো। এদের হালচালটা ভালমত বুঝে নিতে দাও।

—এভাবে তো আর দিন কাটে না।

—এ কি তুমি একা? আমাদের সকলেরই তো এক অবস্থা। যা কিছু করতে হবে সবাই মিলে করতে হবে। এখানে একার কাজ কিছু নেই।

ইয়াকুব আর কিছু বললো না।

বলরাম ইয়াকুবকে কেন যে অপেক্ষা করতে বলেছিল কে জানে। আরও সাতদিন কেটে গেল। জাঙ্গাল তৈরী হয়ে গেল অনেকখানি, কিন্তু বন্দী মজুরদের একটানা কাজের কোন হেরফের হলো না।

এদিকে ইয়াকুব দিনে দিনে অধৈর্য হয়ে উঠছে। ডিসুজাকে দেখলেই চাপাগলায় সে গাল দেয়।

একদিন দুপুর রোদে ঘামতে ঘামতে সহসা হাতের কোদাল ফেলে দিয়ে সে বলে উঠলো—আর পারছি না।

ডিসুজা কাছেই ছিল, এগিয়ে এসেই মুখের উপর এক ঘা বেত কষিয়ে দিল।

ইয়াকুবও তৈরী ছিল, সাহেবের হাত থেকে বেতটা কেড়ে নিয়ে ভেঙে দিল।

ডিসুজা কোমরবন্ধ থেকে তলোয়ার টেনে নিলে।

ইয়াকুবও শাবলটা তুলে নিলে হাতে।

ঠিক সেইসময় একজন পর্তুগীজ ওদিক থেকে ছুটে এলো,

চীৎকার করে নিজের ভাষায় সে কি যেন বললে। ডিসুজা চমকে উঠলো। হাতের তলোয়ার হাতেই রইল, ইয়াকুবের কথা সে ভুলেই গেল। পর্তুগীজ ছোকরাটির পিছনে সে ছুটলো নিজেদের তাঁবুর দিকে।

ব্যাপারটা যে বিশেষ গুরুতর তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

বলরাম একটু তফাতে থেকে ডিসুজার অনুসরণ করলো।

পুকুরটা পার হয়েই খানিকটা জলা-জংলা জায়গা। তারপরেই ফাঁকা মাঠ। মাঠের মাঝে সারি সারি তাঁবু পড়েছে। এই তাঁবুগুলোতেই বোম্বেটেরা থাকে।

একটা তাঁবুর সামনে একটা লোক শুয়ে আছে, আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আরো তিন-চারজন সাহেব। ডিসুজা তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালো। তাদের ভাষায় কি সব কথা হলো। ডিসুজা বসে পড়লো, শুয়ে থাকা মানুষটির পাশে।

এবার বলরাম সাহস পেল, গুটি গুটি গিয়ে দাঁড়ালো বোম্বেটেদের পিছনে। একজন সাহেব তাকে দেখেই বললো—কি চাও? যাও—

বলরাম বললো—আমি হেকিম। কি হয়েছে বল?

—হেকিম? এ দেশী হেকিমের কাজ নয়। সাপে কেটেছে, সাপে কাটার ওষুধ জানিস?

—সাপে কেটেছে? আমি ওষুধ জানি।

বলরাম সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ডিসুজাকে সরিয়ে দিয়ে পড়ে-থাকা সাহেবের পাশে বসে পড়লো। সাহেবের মুখ থেকে তখন ফেনা উঠছে।

বলরাম সাহেবের ধমনীর গতি পরীক্ষা করলো। কপালে হাত রাখলো। চোখের পাতা তুলে চোখের মণি দেখে নিলে। তারপর বললো—সাহেব, জল্দি গরম পানি বানাও, আমি দাওয়াই নিয়ে আসছি--

বলরার ছুটলো পুকুরের পিছনে জঙ্গলের দিকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কিছু জংলী লতাপাতা ছিঁড়ে নিয়ে

বলরাম ফিরে এলো। বললো—শিল-নোড়া, নয়তো হামানদিস্তা নিয়ে এসো, নিয়ে এসো গরম জল……

এক সাহেব একটা ছোট পিতলের হামানদিস্তা নিয়ে এলো। আরেকজন নিয়ে এলো গরম জল। গরম জলে হামানদিস্তা ধুয়ে নিয়ে বলরাম লতাপাতা ছেঁচতে বসলো। বললো—তোমরা ততক্ষণ ওর মাথাটা ঠাণ্ডা জলে ধুইয়ে দাও—

মাথা ধোয়ানো হলো। ইতিমধ্যে লতাপাতার রসও বলরাম তৈরী করে ফেললো। তারপর রোগীকে হাঁ করিয়ে ফোঁটা ফোঁটা সেই রস মুখে দিতে লাগলো। এবার বলরাম জিজ্ঞাসা করলো—কোথায় কামড়েছে, কেউ জানে?

একজন সাহেব দেখিয়ে দিল বাঁ হাতের তালুর উল্টো পিঠে দুটো দাঁতের দাগ। সেখানে দু ফোঁটা রক্ত জমে আছে।

বলরাম সাহেবের ছোরাখানা নিয়ে সেইখানে খানিকটা চিরে ফেললো, শিকড়-বাটা খানিকটা লাগিয়ে দিল সেখানে।

মিনিট দশেক পরে আরো খানিকটা শিকড়-বাটা রস বলরাম রোগীকে খাইয়ে দিল, তারপর বললো—আবার মাথাটা ঠাণ্ডা জলে ধুইয়ে দাও, চাপড়ে চাপড়ে তালুতে জল দিতে থাকো, মাথাটা এখন ভিজেই থাক্।

রোগীর মাথায় চাপড়ে চাপড়ে জল দেওয়া চলতে থাকে। বলরাম নাড়ী ধরে বসে রইল, পাঁচ-সাত মিনিট পরপর এক এক চামচ রস খাওয়াতে লাগলো রোগীকে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে চললো, তারপর বলরাম বললো—অবস্থা ফিরেছে, আর ভয় নেই। এবার আমার কাঁচা দুধ চাই সেরখানেক।

—দুধ? দুধ তো এখানে পাওয়া যাবে না। এখানে তো কারও গরু নেই।

তাহলে তো অনুপানের অভাবে ওষুধ ভাল কাজ করবে না। সুস্থ হতে দেরী হবে।

—কিন্তু দুধ এখানে কোথায় পাই? ব্র্যাণ্ডি দিলে হবে।

বলরাম হাসলো, বললে —ঠাণ্ডা জল দাও —ওষুধ খাওয়াবো।

রোগী তখন চোখ মেলেছে। বলরাম বেশ-কিছুটা পাতার রস ঠাণ্ডা জলে গুলে রোগীকে খাইয়ে দিলে। বললো —এবার ওকে বসিয়ে দাও। ওকে এখন বসিয়েই রাখতে হবে চার প্রহর। ঘুমুতে চাইলেও শুতে দেবে না কাল এই সময় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। আমি চল্লাম—

বলরাম উঠে দাঁড়ালো।

ডিসুজা বললো—তুমি কোথায় যাইতেছ?

বলরাম বললো—আমি তো মজদুর, তোমাদের মাটি কাটিগে—

ডিসুজা বললো —তোমাকে এখন আর মাটি কাটিতে হইবে না, তুমি এইখানে থাকিবে। আমি তোমাকে কাজের ছুটি দিলাম। পরে তোমার অন্য ব্যবস্থা করিব। তুমি অনেক ভাল হেকিম আছ।

বলরাম সেইখানে আবার বসে পড়লো।

॥ সাত ॥



বলরামকে ডিসুজা মেট করে দিলে। একটা মোটা বেত দিয়ে বললো —যে দেখবে কাজ করছে না তাকেই পেটাবে। মার খেলেই এরা সোজা থাকবে।

বলরাম হাঁ-না কিছুই বলেনি, বেতটা হাতে নিয়ে ডিসুজার পিছু-পিছু লাইনে গিয়েছিল। বন্দীরা বুঝলো বলরাম মুরুব্বি ধরে ফেলেছে, এখন সে ঘরশত্রু বিভীষণ।

ইয়াকুব একসময় চাপা গলায় গর্জন করে উঠলো - শয়তান!

বলরাম সারাদিন লাইনের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ঘুরলো। হাতের বেতটা নিয়ে সে খেলা করে। কাউকেই মারধোর করে না। চাপা গলায় বলে —ভাই, মুখ বুঁজে কাজ কর, দিন আসবে—

সন্ধ্যাবেলায় ডিস্যুজা বললো—হেকিম, তুমি আর এখন লাইনে ওদের মাঝে শুতে যাবে না, তুমি আমার তাঁবুর সামনে শোবে।

বলরাম এবার মাটি-কাটার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

তবে বলরাম মেট হবার ফলে যারা মাটি কাটছিল তাদের খানিক সুবিধা হলো, যখন তখন ডিস্যুজা সাহেবের হাতে মার খাওয়া থেকে তারা রক্ষা পেল। নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় দু-চারটে কথা বলারও তারা ভরসা পেল।

ডিস্যুজা দু-তিনবার বলরামকে বলেছিল—কাজ তাড়াতাড়ি হচ্ছে না। তুমি মারধোর করো না। জল্‌দি কাজ পেতে হলে এদেরকে মার দিতে হবে।

বলরাম বললো—কাজ না করলে আমি তো মারি।

—কই? আমার তো নজরে পড়ে না?

বলরাম চুপ করে থাকে। বলরাম মনে মনে জানে ডিস্যুজা সাহেব আর যাই করুক, এখন তার উপর জুলুম করতে পারবে না। কারণ, সম্প্রতি এদিকে সাপের উপদ্রব বেড়েছে, বলরাম এই পনেরো দিনের মধ্যে আরো পাঁচটা সাপে কাটা রোগীকে আরাম করেছে, তার মধ্যে চারজন সাহেব। বলরাম এখন সাহেবদের মাঝে খুব খাতিরের লোক—কালা হেকিম—সাপের বদ্যি।

এদিকে সাগরের পার ধরে উঁচু জাঙ্গাল অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

দ্বীপের পূর্ব দিকে তারা কাজ করছে, ওদিকে পশ্চিম দিকের জলা-জঙ্গলের পিছনে যে একটা বড় ব্যাপার চলছে তা ওরা এখান থেকে বুঝতে পারে। ওদিকে সারি সারি হার্মাদদের জাহাজ গিয়ে ভেড়ে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে দু-চারজন সাহেব এদিকে আসে, এখানে তাঁবুর বোম্বেটে বাসিন্দাগুলোর সঙ্গে সারাদিন খানাপিনা করে, তারপর আবার চলে যায়। বলরাম এই কয়দিনে এটা বেশ বুঝতে পেরেছে যে সন্দীপে হার্মাদদের একটা বড় ঘাঁটি হয়েছে।

আরেকটা ব্যাপারও বলরাম দেখছে, দিনে দিনে মাটি-কাটার লাইনটা লম্বা হচ্ছে। বন্দীর সংখ্যা বাড়ছে।

বলরামের কৌতূহল জাগে, কিন্তু ওদিকটায় গিয়ে ওই মানুষ-গুলোকে যে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবে সে অবকাশ সে পায় না। কারণ এই দিকটা বলরামের উপর ছেড়ে দিয়ে ডিসুজা নিজে ওদিকটার তদারকি করে।

মজুরদের লাইনটা এখন দুভাগ হয়ে গেছে। মাঝে আট-দশ হাত চওড়া একটা খাল কেটে ভিতরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই খাল দিয়ে নৌকা আসে। খালের এধারের তদারকি বলরামের, ওদিকে ডিসুজার।

দিন যায়।

বলরাম তদারকি করে আর ভাবে কিভাবে এখান থেকে রেহাই পাবে।

খালে মাঝে মাঝে খালি নৌকা বাঁধা থাকে। নৌকা রেখে সাহেবরা তাঁবুতে যায়। বলরাম ভাবে এক রাতের অন্ধকারে একখানা নৌকা নিয়ে সে ভেসে পড়বে। কিন্তু সে একা সারারাতে কতটুকু পথই বা যেতে পারবে? দিনের আলোয় আবার হার্মাদদের নজরে পড়ে যাবে। তখন? নদীর বুকে তো লুকোবার মত ঝোপঝাড়, বন-বাদাড় নেই।

বলরাম ভাবতেই থাকে, ভাবতে ভাবতে অনেক সময় মাথাটা গরম হয়ে যায়, আর ঘুম আসে না।

এদিকে ক্যাপ্‌টেন গন্‌জালিশ দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে।

সন্দীপের সমস্ত পশ্চিম অঞ্চলটা জুড়ে সে তার পাকাপোক্ত ঘাঁটি বানিয়ে ফেলেছে। ছোট ছোট এলোমেলো বোম্বেটে দলগুলিকে সে একত্র করেছে। তার দলের বোম্বেটে পল্টনের সংখ্যা হয়েছে প্রায় হাজার খানেক। সেই সঙ্গে যত গুণ্ডা ও বদমায়েস পেয়েছে সবাইকে নিয়ে এসেছে, বলেছে—লুটের বখরা দেবো শুধু দলের হয়ে লড়াই

করতে হবে। ভাল লড়তে পারলে পরে তালুকদার বানিয়ে দেবো।

দেশী সেই সব সিপাই-লস্করের সংখ্যাও এসে পৌঁছেছে দু-হাজারে।

গনজালিশ আরেকটা কাজ করেছে, যা আর কোন বোম্বেটে করতে পারে নি। নানা জায়গা থেকে সে দুশো ঘোড়া জোগাড় করেছে, সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করেছে দুশো ঘোড়সওয়ার।

ক্যাপ্‌টেন গন্‌জালিশের বোম্বেটেগিরি করে লুঠের সম্পদ নিয়ে দেশে ফিরে যাবার আর মতলব নেই। সে এদেশে রাজা হয়ে স্থায়ী লুঠের ব্যবস্থা পাকা করতে চায়। সেই পরিকল্পনা নিয়েই সে এবার সংগঠনে নেমেছে।

শুধু সৈন্য সংখ্যাই নয় গনজালিশ জাহাজের সংখ্যাও বাড়িয়েছে। আগে আগে বড় বড় জাহাজ ঘায়েল করে তারা আগুন লাগিয়ে দিত, এখন আর তা করে না, জাহাজখানা টেনে নিয়ে আসে সন্দীপের বন্দরে, সেখানে নিজের সুবিধামত তার খানিক অদলবদল করে পুরোদস্তুর যুদ্ধ জাহাজ করে তোলে। যে গনজালিশ একখানি মাত্র জাহাজ নিয়ে হিন্দুস্থানের দরিয়া তোলপাড় করতো, এখন তার হুকুমে ছোট বড় চল্লিশখানা জাহাজ সন্দীপের দরিয়ায় ঘুরে বেড়ায়।

এখন শুধু একটা কাজ বাকি, দ্বীপের জাঙ্গালটা শেষ করে বুরুজে বুরুজে কামান বসাতে পারলেই ঘাঁটি শক্ত হয়ে যায়।

এতো অল্প দিনের মধ্যে এতো কাজ করা একজন বোম্বেটে সর্দারের পক্ষে সামান্য কথা নয়।

গনজালিশ ঠিক করেছে, সন্দীপের ঘাঁটি শক্ত করে পদ্মার দুপাশের তীর ধরে সব জনপদ সে দখল করবে। মোগলের নৌবহর তেমন শক্তিশালী নয়, তাদেরকে একবার হারিয়ে তাদের শক্তি সামর্থ্য সে বুঝে নিয়েছে, তাদেরকে আরও দু-দশবার হারিয়ে দেওয়া কঠিন হবে না। তখন সে-ও হবে এক ভূঞা।

তারপর প্রতিবেশী এক এক ভূঞাকে ঘায়েল করে রাজা হবার স্বপ্ন।

গনজালিশ বেশীর ভাগ সময় জাহাজেই থাকে। গড়খাইয়ের কাজ শেষ হয়ে আসছে শুনে মাঝে একদিন সদলবলে এদিকে এসে দেখে গেছে। ডিসুজাকে বলে গেছে—তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করো—

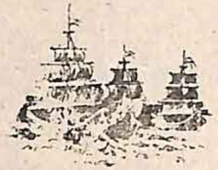
সেইদিনই গনজালিশ খুঁটি পুঁতে নিশানা রেখে গেছে কোথায় কোথায় বুরুজের উপর কামান বসানো হবে।

সমুদ্র-সীমায় এই দ্বীপটি গনজালিশের ভারী পছন্দ, এইটিকেই সে তার রাজধানী করবে।

সেইদিন থেকে ডিসুজা বলরামের উপরেও কাজের তদারক করে ঘুরছে বার বার। তবে বলরাম মাঝে থাকায় বন্দী মজুরদের উপর সে আর মারধোর করে না।

বলরাম সব কিছু দেখে আর ভাবে। এইভাবে বন্দী দাস হয়ে থাকাই কি তার বিধিলিপি? এই যে এতোগুলো মানুষ এইভাবে খাটছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে আর ভগবানকে ডাকছে, এদের এই কষ্টের কি তাহলে পরিত্রাণ নেই? মৃত্যু ছাড়া কি তাহলে এদের মুক্তির আর কোন পথ নেই? ভগবান বলে তাহলে কি সত্যই কিছু নেই? ভগবান নিজে তো কিছু করবেন না, কিন্তু যারা কিছু করবে তাদেরকে শক্তি দেবেন, সুযোগ পাইয়ে দেবেন, তাই-বা দিচ্ছেন কই? বলরাম তো কিছু করতে চায়,—নিজের জন্য নয়, এদের সকলের জন্য, কিন্তু সে অবকাশ তো ভগবান তাঁকে দিচ্ছেন না।

বলরাম ব্রাহ্মণ সন্তান। সে বিশ্বাস করে যে নামজপ করলে শক্তিলাভ করা যায়। সন্ধ্যা থেকে সে চুপ করে বসে থাকে। অন্ধকারে বসে বসে মা-কালীর নাম জপ করে, আর বলে—মা, আমাকে শক্তি দাও, বুদ্ধি দাও, সুযোগ দাও। এতোগুলি মানুষের এই কষ্ট, তুমি মুখ তুলে চাও মা—



॥ আট ॥

একদিন সকাল থেকে পরপর অনেকগুলি জাহাজ দেখা দিল মেঘনার বুকে। নির্মেঘ আকাশের দীপ্ত সূর্যালোকে জাহাজের কালো পালগুলি নজরে আসে।

এক নজরেই বলরাম বুঝতে পারে ওগুলো হার্মাদদের জাহাজ। জাহাজের ছাদের উপর কামানের নলগুলো এত দূর থেকেও চোখে পড়ে।

বোম্বেটেরা এতোগুলো জাহাজ করেছে দেখে বলরাম অবাক হয়। সামনের কয়েকটাকে গুনে ফেলে কিন্তু তাদের পিছনে আরো আছে বলে মনে হয়।

মাঝে মাঝে দূরের দিক্‌সীমায় দু-একখানা পালতোলা জাহাজ এদিকে এসে আবার সীমান্তে সরে যায়।

হার্মাদরা তাহলে এখানে সব নাওয়ারা ফৌজ একত্র করছে। আরেকটা লড়াইয়ের জন্য তৈরী হচ্ছে নিশ্চয়। তবে কি নবাবী-নৌবহর আবার লড়তে আসছে ?

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এদিক থেকে আরো কয়েকখানি জাহাজ ওদের কাছে চলে গেল।

সামনের বড় স্লুপটার মাথায় একটা কালো পতাকায় মড়ার খুলি আঁকা। ওটাই ক্যাপ্‌টেন গনজালিশের জাহাজ। বন্দী মজুরেরা অনেকেই ঐ জাহাজ চেনে।

আরো ঘণ্টাখানেক পরে সব ক'খানি জাহাজ সারি সারি উত্তর-মুখী চলে গেল। যাত্রা শুরু করার আগে গনজালিশের জাহাজ থেকে একটা তোপধ্বনি করা হলো।

এখানকার কয়েকজন সাহেব পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখলো, সাড়া তুললো—হুররে!

জাহাজগুলি দিক্সীমার শেষে হারিয়ে গেল।

মজুরেরা এতক্ষণ কাজ থামিয়ে দেখছিল, জাহাজগুলি অদৃশ্য হতেই ডিসুজা এদিকে তাকালো, হাতের বেত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন মজুরকে কয়েক ঘা কষিয়ে দিলে। তারপর বলরামকে বললো—তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? আমাদের ক্যাপ্টেন দিগ্বিজয় করতে বেরুলো। সাত-আটদিনের মধ্যে ফিরবে, ভবানীগঞ্জ অবধি নদীর পারের সব গাঁও লুঠে আনবে। সেই সাতদিনের মধ্যেই এই খড়খাই শেষ করা চাই। বুরুজে বুরুজে কামান পাতা হবে। এটাই হবে আমাদের বড় আস্তানা—ক্যাপ্টেন গনজালিশ রাজা হলে এটাই হবে আমাদের রাজধানী। কাউকে এক মিনিট দাঁড়াতে দেবে না। পুরোদমে কাজ চালাও। এখানে আমাদের সদর আপিস হলে তোমাকে আমি জমাদার করে দেবো।

বলরাম হাসলো, বললো—এতো বড় নৌবহর তো আমরা কখনও দেখি নি, তাই দেখছিলাম—কত জাহাজ, কত কামান—

ডিসুজা বললো—এ কি শুধু আমাদেরই নৌবহর নাকি? আমাদের তো বিশখানা জাহাজ, আর বাকি সব আরাকানদের রাজার জাহাজ। এতো বড় বহর তোমাদের বাদ্শার নেই। যদি শুধু জলে লড়াই হতো তাহলে মোগল বাদ্শাকে হটিয়ে আমরা এতদিনে দিল্লী দখল করে নিতাম। তবে শিগগীরই বাংলা মুল্লুক আমরা দখল করবো তুমি দেখো—

বলরাম বললো—জলে তোমরা খুব ভালো লড়তে পার সাহেব, আমরা জানি।

ডিসুজা হো হো করে হেসে উঠলো, বললো—লড়াই না জানলে পর্তুগাল থেকে এসে আমরা এই বাংলা মুল্লুকে এসে দিগ্বিজয় করতে পারি?

তারপর সহসা গম্ভীর হয়ে বললো—যাক্, আর কথা নয়। তুমি এবার জল্দি কাজ চালাও—

বলরাম আবার লাইনে ঘুরতে শুরু করলো।

এখন এদিকের অনেক মজুরকেই সে চেনে। তাদের সামনে যায়, নীচু গলায় এক একজনকে জিজ্ঞাসা করে—দেশে তুমি কি করতে? একে একে সবাইকেই জানা হয়ে যায়। গাঁয়ের সব রকম মানুষই এইদলে আছে। বামুন, কায়েত, বেণে, মুচি, কলু, কাঁসারী, কামার, কুমোর, ধোপা, জেলে, বাগদী—সবাই এক হয়ে গেছে মাটি কাটার দলে।

লাইনের শেষ দিকে কয়েকজন পাইক-পেয়াদাও আছে।

জেলেদের বলরাম জিজ্ঞাসা করে—রাতে ডিঙ্গি নিয়ে মেঘনায় পাড়ি জমাতে পারবে?

—কেন পারবো না, এতদিন তো তাই করে এসেছি— শেষ রাতে ডিঙ্গি নিয়ে মাছ ধরতে বেরোই নি?

—ঠিক আছে, কাল রাতে দরকার হবে, তৈরী থাকবে।

পাইকদের বলরাম জিজ্ঞাসা করে—বন্দুক চালাতে জানো?

—জানি, সড়কি চালাতেও পারি।

—ঠিক আছে, কাল রাতে দরকার হবে, তৈরী থাকবে। কাউকে কিছু বলো না।

কতজন যে হলো, বলরাম শেষ অবধি গুনে ঠিক রাখতে পারলো না। তবে জনা পঞ্চাশের কম নয়, সত্তর-আশীও হতে পারে।

তা সে যতজনই হোক, লোকই বলরামের দরকার।

বলরাম মনে মনে একটা কর্মসূচীর খসড়া করে ফেললো।

॥ নয় ॥



গ্রীষ্মকাল।

বন্দী মজুরের দল সবাই ফাঁকা মাঠেই পড়ে থাকে। রাতের অবকাশে কয়েকজন গাছের ডালপালা আর গোলপাতা দিয়ে লম্বা একটা ঝোপড়ি গোছের ছাউনি করেছে, তার মধ্যেও সারি সারি সব শুয়ে থাকে।

যার যেমন সুবিধা হয়।

সেদিন দুপুরে বলরাম নির্দিষ্ট মানুষগুলিকে একে একে বললো— গামছাখানা মাথায় বেঁধে আজ ফাঁকায় শুবি, আমি যেন অন্ধকারে একবার দেখেই বুঝে নিতে পারি।

কেউ কেউ বলে —আমাদের তো গামছা নেই।

—লতাপাতাওলা একটা গাছের ডাল, মাথার চুলে গুঁজে শুবি তাহলেই আমি চিনবো।

বিকাল বেলা লাইনে ঘুরতে ঘুরতে বলরাম আর একবার বলে যায়— কাউকে কিছু বলবি নে, সবাই জানলে ব্যাপারটা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। সজাগ থাকবি, খেয়াল রাখবি আজ রাতদুপুরে—সামান্য গোলমাল করে ফেললেই আর মুক্তির কোন আশা থাকবে না।

কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে—কি করতে হবে কিছু তো বললে না?

—না। সে তখন বলবো।

বন্দীর দল সারাদিন উন্মুখ হয়ে রইল।

তারপরেও বলরাম অনেকবার সকলের সামনে দিয়ে চলাফেরা করলো কিন্তু আর কিছুই কাউকে বললো না।

দিনের শেষে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই তো শুয়ে পড়লো। কেউ কেউ গামছাখানা মাথায় জড়িয়ে নিলে, কেউ কেউ আবার

পুকুরপাড় থেকে লতাপাতা নিয়ে এসে গুঁজলো মাথার চুলে। যারা জানে না, তারা কিছুই বুঝলো না।

যারা জানে তারা জেগে থাকার চেষ্টা করলো।

কিন্তু সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রাত জাগা সহজ নয়। দেখতে দেখতে সবাই একসময় ঘুমিয়ে পড়লো।

একজনের চোখে শুধু ঘুম নেই, সে বলরাম। পাছে ঘুমিয়ে পড়ে আর একঘুমে রাত কেটে যায়, সেই ভয়ে সে সন্ধ্যার পর ওদিকের জঙ্গল থেকে হাতিশুঁড়ের পাতা যোগাড় করে এনেছিল। একটা পাতা হাতে কচ্‌লে নিয়ে চোখের পাতায় একটু ছোঁয়ালেই চোখ চিড়বিড় করে ওঠে, অথচ চোখের কোন ক্ষতি করে না। বরং ঝাপ্‌সা দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

দুশ্চিন্তা আর ঘুম তাড়াতে গিয়ে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। সারা-দিনের ক্লান্তি অবসন্ন করে তোলে। একবার মনে করে পুকুরের জলে একটা ডুব দিয়ে শরীরটাকে ঠাণ্ডা করে নেবে। কিন্তু যাই-যাই করেও ভূমিশয্যা ছেড়ে আর উঠতে পারে না। এক আকাশ তারার পানে তাকিয়ে শুধু প্রহর গুণতে থাকে।

রাত এগিয়ে চলে।

এখানে শেয়াল ডাকে না। বলরামের হিসাব আছে, অমাবস্যার পর সাত-আট দিন কেটে গেছে, এখন দুপুর রাতেই চাঁদ উঠবে।

চাঁদ ওঠে।

বলরামও উঠে পড়লো।

তাঁবুর ভিতর থেকে সাহেবদের নাকডাকার শব্দ আসছে, মদ খেয়ে সব ঘুমুচ্ছে। ওদিকে একজন পাহারা দিচ্ছে, অর্থাৎ বন্দুকটা দুই হাঁটুর উপর রেখে তাঁবুর খুঁটিতে হেলান দিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে।

বলরাম পায়েপায়ে এগিয়ে এলো মজুরদের লাইনে। একে একে মাথায় গামছা-বাঁধা আর লতাপাতা-গোঁজা মানুষগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, সামান্য একটা ঠেলা দিয়ে বললো—চুপিচুপি উঠে আয়—

দেখতে দেখতে সত্তর-আশী জন বন্দীমজুর উঠে পড়লো। নীরবে সঙ্গ নিল বলরামের।

ঝিলটার ধারে এসে বলরাম সবাইকে নিয়ে বসলো, বললো—এবার আমাদের বাঁচার লড়াই, এখনি শুরু করে ঘুদণ্ডে শেষ করতে হবে। ওদিকের দশটা তাঁবুতে কুড়িজন বোম্বেটে আছে। বাইরে একজন পাহারা দিচ্ছে আর উনিশজন ভিতরে ঘুমুচ্ছে। পাহারাদারের হাতে বন্দুক আছে তবে সে ব্যাটাও বসে বসে ঘুমুচ্ছে। আগে ওকে ঘায়েল করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর ভিতরে ঢুকে যেসব সাহেব ঘুমুচ্ছে, সবাইকে বেঁধে ফেলতে হবে। কেউ চেঁচাতে গেলেই তারই জামা-কাপড়ে তার মুখ বেঁধে ফেলতে হবে।

—বাঁধবার দড়ি ?

—দরকার হবে না, এক একটা তাঁবুর মধ্যে চাদর-গামছা অনেক পাওয়া যাবে। গরমের জন্যে এক একজন সাহেব তিন-চারখানা করে গামছা ব্যবহার করে।

ইয়াকুব পাশেই ছিল, বললো—আবার বাঁধাবাঁধির এতো হাঙ্গামা কেন, শয়তানগুলোকে একেবারে খতম্ করাই তো ভালো।

বলরাম বললো—না, ওদেরকে বন্দী করে রাখলে ভবিষ্যতে আমাদের কাজে লাগবে।

ইয়াকুব বললো—ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখলেই আবার আমাদের বিপদ ঘটবে।

বলরাম বললো—আমরা এতজন আছি, বিশটা মানুষকে খতম করতে আর কতক্ষণ সময় লাগবে ? এখন ওদের বেঁধে রাখো, আমি যা বলছি তাই করো—

বলরাম দল নিয়ে অগ্রসর হলো।

পাহারাদার তাঁবুর খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছিল, বলরাম পিছন থেকে গিয়ে সোজা তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়লো। পিছনে আরো ক'জন ছিল।

রক্ষী একটাও সাড়া তুলতে পারলো না। তার চমক ভাঙার

আগেই তাকে কাবু করে সবাই নিঃশব্দে তাঁবুগুলোর ভিতরে ঢুকে পড়লো।

হার্মাদরা মদ খেয়ে আরাম করে নাক ডাকাচ্ছিল। তাদেরকে আর মাথা তুলে বসতে হলো না।

ওখানে চল্লিশটি বন্দুক হাতে এলো, গুলি ও তলোয়ার মিললো অনেক। বলরাম বললো সবাই এবার এক একটা করে হাতিয়ার নাও, কাজে লাগবে।

এবার কয়েকজন জেলেকে সঙ্গে নিয়ে বলরাম এলো ঘাটে। ঘাটে কয়েকখানি নৌকা বাঁধা ছিল, বলরাম সবাইকে নিয়ে নৌকায় চড়ে বসলো।

নদীতে একখানি জাহাজ নোঙর করা ছিল, দুখানি নৌকা গিয়ে ভিড়লো সেই জাহাজখানির পাশে।

জাহাজের গায়ে দড়ির সিঁড়ি ঝুলছিল। বলরাম ও কয়েকজন সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

চারজন হার্মাদ জাহাজের ডেকে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল, তাদেরকে বেঁধে ফেলতে আর কতটুকু সময় লাগে!

জাহাজ দখল হয়ে গেল।

কয়েকজনকে জাহাজে রেখে বলরাম ফিরে এলো।

রাত তখনও শেষ হতে অনেক বাকি।



॥ দশ ॥

চাঁদের আলোয় মাঠ ঘাট সবই মোটামুটি নজরে আসছে।

নদীর তীরে বসে এবার সবাই মিলে পরামর্শ হলো। এদিকে একখানা জাহাজ ছিল তা দখল করা গেছে। চব্বিশ জন হার্মাদ বন্দী হয়েছে। কিন্তু ওদিকটায় তো হার্মাদদের আস্তানা আছে,

সেখানেও কিছু বোম্বেটে আছে। তবে তারা সংখ্যায় বেশী হবে না। কারণ বেশীর ভাগ হার্মাদ তো গিয়েছে লুঠের ধান্ধায়। রাত শেষ হবার আগেই ওদিকটায় চড়াও হতে হবে। যদি ছোটখাটো মারা-মারি একটা ঘটে তাতেও ভয় করার কিছু নেই। অনেক বন্দুক ও তলোয়ার তো বলরামের মজুর-দলের হাতে এসে গেছে।

বলরাম বললো—আর দেরী করা ঠিক নয়, নদীর ধার দিয়ে এখনি ওদিকটায় যাওয়া দরকার, ভোর হবার আগেই কাজ শেষ করতে হবে।

সবাই হাতিয়ার হাতে নিয়ে উঠে পড়লো।

বলরাম বললো—তোমাদের মধ্যে সবাইকার শরীর সমান নয়, আজ সারাদিনের খাটুনির পর এই রাতজাগায় যারা ক্লান্তি বোধ করছ তারা এখানে বসে জিরোও। এতে লজ্জার কিছু নেই।

সবাই সাড়া তুললো—আমরা কেউ ক্লান্ত হই নি। আমরা দুষমনদের শেষ করবো। এখন আবার জিরেন কি ?

নদীর ধার দিয়ে বলরামের দল এগোলো।

জ্যোৎস্না রাতে নদীর ধার দিয়ে একসারি মানুষ এগিয়ে চললো নীরবে, দ্বীপের আর এক দিকে।

ক্রোশ খানেক পথ। একটা জঙ্গলকে পাশ কাটালেই হার্মাদদের আরেক ঘাঁটি। এইটাই সন্দীপের আসল ঘাঁটি।

সারি সারি তাঁবু। চাঁদের আলোয় যেন মনে হয় একদল হলুদ রঙের জানোয়ার মাঠের মাঝে দল বেঁধে পড়ে আছে।

অতোগুলো তাঁবু দেখলেই মনে হয় যেন কত মানুষই আছে। কিন্তু আসলে বেশীর ভাগ তাঁবুই শূন্য। হার্মাদরা কোথাও গেলে তাঁবু তুলে যায় না। লুঠতরাজ করে কখন রাত-বিরেতে ফিরবে, কিছুই তো ঠিক নেই। কে আবার তখন নতুন করে তাঁবু ফেলে ! তাঁবু তাই ফেলাই থাকে, আসবে আর ঢুকবে।

তাঁবুর মধ্যে ওরা উঁকি মেরে দেখলো, সব শূন্য। মাঝের একটা বড় তাঁবুর মধ্যে জনা দশ-বারো সাহেব পড়ে আছে। তাঁবুর চারটে

দরজাই খোলা। হু হু করে হাওয়া বহে যাচ্ছে। দুটো বড় বড় তাড়ির কলসী একপাশে। তাড়ি খেয়ে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় আরাম করে ওরা ঘুমুচ্ছে।

সেই আরামের ঘুম ভাঙালো সশস্ত্র বন্দীর দল।

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সব ক'জন সাহেবের হাতেই দড়ি পরালো। ওদের ভাল করে ঘুম ভাঙলো তারপরে।

এবার মজুরদের মধ্যে উল্লাস দেখা দিল। আর চুপ করে কেউ রইল না, সবাই বলরাম পণ্ডিতের জয়-জয়কার করতে লাগলো।

বলরাম বললো—এখন সোরগোল করে সময় কাটাবার অবকাশ নেই। এখানে হাতিয়ার কি আছে দেখ, আমাদের এখানে এখনও যারা রয়েছে তাদেরকে হাতিয়ার জুগিয়ে দিতে হবে। তারপর এই দ্বীপ পুরোপুরি আমাদের দখলে রাখতে হবে। বোম্বেটেরা আর যেন এই চরায় নামতে না পারে। সব ক'জন বন্দীকে নিয়ে আমি ভোরের আলোয় হাতিয়া চলে যাবো। শুনেছি সেখানে বাদশাহী নৌবহরের একটা ঘাঁটি হয়েছে। সেখানে এই হার্মাদগুলোকে আমি পৌঁছে দেবো, নবাবের দরবারে ওদের বিচার হবে। আর ওখান থেকে আমি নবাবী ফৌজ নিয়ে আসবো, এখানকার ঘাঁটি শক্ত করার জন্য। হার্মাদ গনজালিশ ফিরবে সাত-আট দিনের মধ্যে। তার মধ্যে আমি ফিরে আসবো। এর মধ্যে তোমরা কাজটা শেষ করে রাখবে। ওদেরই অস্ত্র দিয়ে আমরা ওদেরকেই ঘায়েল করবো।

—কিন্তু তুমি না থাকলে আমরা কার কথায় চলবো?

—লড়াইয়ের ব্যাপারে আমার চেয়েও যোগ্য লোক তোমাদের মধ্যে রয়েছে, মনসবদারের ছেলে এই ইয়াকুব খাঁ। এই এখন থেকে তোমাদের দলপতি।

ইয়াকুব বললো—আমি এখানে থাকলে এই ডিসুজা সাহেবকেও এখানে রেখে যেতে হবে। আমার বাপজানের খুনের বদ্‌লা আমি নেবো।

বলরাম বললে—তুমি যদি চাও তাহলে ডিসুজা এখানে থাকবে।

কিন্তু একটা কথা, আমি ফিরে না আসা অবধি তুমি কিছু করবে না। শত্রুপক্ষের সর্দারকে জামিনে ধরে রাখতে পারলে অনেক সঙ্কটের সময় যুদ্ধের অনেক সুবিধে হয় ঐ কথাটা ভুলে যেও না।

॥ এগারো ॥



ঠিক ভোরবেলায় বলরাম রওনা হতে পারলো না। এতো বড় ব্যাপারের পরে সবাই ভাল করে খেয়েদেয়ে যাত্রা করতে চাইল। বোম্বেটেদের আস্তানায় চালডালের অভাব ছিল না। শেষ রাতেই বড় বড় চুল্লীতে আগুন জ্বালিয়ে রান্না সুরু হয়ে গেল।

খিচুরী, কল্মী শাক সিদ্ধ আর গুড়, অনেকদিন পরে বন্দীরা তাই পেট পুরে খেল। তারপর বলরাম জাহাজ ছাড়লো। বেলা তখন এক প্রহর প্রায় পার হতে চলেছে।

সন্দীপ থেকে হাতিয়ার দূরত্ব বেশী নয়, সাত-আট ক্রোশ মাত্র।

বাতাস ছিল অনুকূল। দাঁড়ী-মাঝিগুলিও ছিল পুরানো পাকা লোক।

সন্ধ্যার আগেই জাহাজ চর আমানুল্লার কাছে এসে পড়লো।

নবাবী নৌবহরের ছিপ তদারকি করে বেড়াচ্ছিল, তারা দেখে অবাক হলো, এমন দিনের আলোয় একখানা বোম্বেটে জাহাজ তাদের ঘাটের দিকেই আসছে। দুঃসাহস তো কম নয়!

জাহাজ কাছে এলো।

জাহাজ নোঙর করলো।

কিন্তু জাহাজের ছাদে বোম্বেটে লালমুখ তো একটাও দেখা যায় না।

আরো কয়েকখানি নবাবী ছিপ এগিয়ে এলো। নায়েকী ছিপ বন্দুক উঁচিয়ে কাছে গেল, হাঁক দিল—স্লুপ কার?

বলরাম ছাদ থেকে জবাব দিল—বন্দী জাহাজ।

—বন্দী জাহাজ? কার বন্দী?

—বোম্বেটে জাহাজ আমাদের বন্দী।

—তোমরা কারা?

—সন্দীপের মানুষ।

—কোথায় যাবে?

—ফৌজদারের কাছে।

—ফৌজদার তো ঢাকায় আছে।

—এখানকার কিল্লাদার কে?

—এখানে কোন কিল্লা নেই।

—এখানকার ফৌজের সেনাপতি কে

—মনসব্‌দার মহম্মদ খাঁ।

—আমরা তার কাছেই যাবো।

সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ থেকে নামার হুকুম হলো। একা বলরামকে নিয়ে নায়েকী ছিপ গেল চরায়।

চর আমানুল্লায় নবাবী নৌবহরের তাঁবু পড়েছিল। বোম্বেটেদের উপর নজর রাখার জন্য, সুবিধামত তাদেরকে ঘায়েল করার জন্য তারা এখানে তৈরী হচ্ছে। দিনে দিনে এখানে আরো ফৌজ এসে জড়ো হচ্ছে।

বলরামকে মনসবদারের শিবিরে হাজির করা হলো।

সেনাপতি মহম্মদ খাঁ বলরামের সঙ্গে কথা বলে অবাক হয়ে গেলেন। পৈতে গলায় সাদাসিদে এই বামুন ছোকরা তো যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও কৌশলী। অনেক কাণ্ড-কারখানা সে করেছে। তিনি তখনই জাহাজ থেকে তেইশজন বন্দী হার্মাদকে নামিয়ে আনার হুকুম দিলেন। বললেন— ওরা অনেক খুন করেছে, অনেক ঘর জ্বালিয়েছে, অনেক মানুষকে ধরে নিয়ে গেছে, অনেক গেরস্থর সর্বনাশ করেছে, ওদের ঢাকায় পাঠাবো, ওদেরকে ফাঁসীতে লটকাবো।

তারপর বলরামকে বললেন—তুমি খুব বাহাদুর ছোকরা আছ,

ফৌজদারকে বলে তোমাকে ইনাম দোব। তুমি এখন তোমার লোকজনদের নিয়ে বিশ্রাম করগে, কাল সকালে তোমার সঙ্গে আমি সন্দীপ যাবো। এই সময় সন্দীপ দখল করে নেওয়াই সুবিধা। তাঁবু আছে, অনেক গুলিগোলা কামান মজুত আছে। বন্দী মানুষগুলোও আছে, যারা দরকার হলে জান-কবুল করে লড়বে। ওদের তৈরী জাঙ্গালটাও আমরা কাজে লাগাতে পারবো।

বলরাম হাতজোড় করে বললো—আমাকে আর ঘোরাঘুরি করাবেন না হুজুর, আপনি আমাকে ছুটি দিন। আমি বামুনের ছেলে, কবিরাজী করি, বন্দুক চালানো, লড়াই করা,—এসবের আমি কিছুই জানি না। কোন মতে ভগবানের দয়ায় হার্মাদদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি, এবার আমি দেশে ফিরে যাবো। অনেক দিন দেশ ছাড়া হয়েছি।

সেনানায়ক বললেন—তুমি ভারী বুদ্ধিমান ছোকরা। তোমার মতো মানুষকে আমি ছাড়বো না। ফৌজদারকে বলে আমি তোমাকে সন্দীপের একজন জায়গীরদার করে দেবো।

বলরাম বললো—না, হুজুর, আমি বামুন পণ্ডিতের ছেলে, গরীব গেরস্থ। এই অবস্থাই আমার ভাল হুজুর, রাজা হতে পারবো না। আমার কবিরাজীই ভাল।

—তুমি পূজো করো না, কবিরাজী কর ?

—হ্যাঁ, হুজুর। এটা আমার তিনপুরুষের পেশা।

—খুব ভাল। তাহলে তো তোমাকে আমার আরো বেশী দরকার। লড়াই হবে, কত মানুষ জখম হবে, তখন তো হাতের কাছে একজন ভাল কবিরাজ থাকা বেশী দরকার। ঠিক আছে, সে সব পরের কথা, এখন তুমি খেয়েদেয়ে আরাম কর গে—



॥ বারো ॥

সেনানায়ক মহম্মদ খাঁয়ের বয়স বেশী নয়। বাপ মজিদ খাঁ ছিল নবাবী ফৌজের জমাদার। ঢাকায় কিল্লাদারের কাছে সে গোলন্দাজের কাজ করতো। ঢাকার দক্ষিণে মুনসীগঞ্জে নদীর তীরে কয়েকটা বুরুজ করে কামান পাতা হয়েছিল, ঢাকা নগরের ঢোকার পথ রক্ষা করার জন্য। পূর্বমুখী প্রথম কামানটি ছিল মজিদ খাঁয়ের। আরাকানী মগ বা পর্তুগীজ হার্মাদরা ঢাকার দিকে অতর্কিতে আসতে পারবে না, সেই কামানের গোলার মুখে তাদের পড়তে হবে।

ওদিকে আরাকানের মগ-রাজার নজর ছিল পূর্ববাংলার উপর। চট্টগ্রাম দখল করে রাজা বোম্বেটেদের সঙ্গে একটা ঘরোয়া চুক্তি করে ফেললেন—মগ ও পর্তুগীজ দুই দল বোম্বেটেগিরি করবে—পদ্মা ও মেঘনার তীরে যত জনপদ আছে সব তারা লুঠ করে বেড়াবে, নিজেদের সুবিধামত তারা চলবে, এ সম্পর্কে এক দল অন্য দলের বিরোধী হবে না।

সুবিধামত দু'দলে ভুলুয়া ও লখিমপুর আক্রমণ করলো ও লুঠ করলো। তেমন জোরালো লড়াই কিছুই হলো না। ক্ষয়-ক্ষতি যা হবার নগরবাসীদেরই হলো—খুন-জখম হলো, বাড়ীঘর পুড়লো, সর্বস্ব লুঠ হলো।

এবার বোম্বেটেদের সাহস বেড়ে গেল, তারা ঠিক করলো সুবাদারের খোদ্ ঘাঁটি তারা আক্রমণ করবে। ঢাকা বড় সমৃদ্ধ নগর, এই নগর লুঠতে পারলে আর লুঠের জন্য অন্য কোথাও যেতে হবে না। তবে এতো বড় নগর তো একবারে লুঠ করা যাবে না, দফায় দফায় সুবিধামত বারে বারে লুঠ করতে হবে।

এক অমাবস্যার রাত্রে তারা চুপিসারে এগিয়ে এলো। আকাশে মেঘ ছিল। তার উপর অমাবস্যার অন্ধকার। কিন্তু ফৌজী ছিপের নজর তারা এড়াতে পারে নি। বুরুজে বুরুজে তারা খবর পৌঁছেছিল। মজিদ খাঁই ছিল প্রথম বুরুজটায়, প্রথম গোলাটা ছুঁড়বার পরেই দ্বিতীয়বার আর তাকে কামান দাগতে হয় নি। বোম্বেটে জাহাজ থেকে এক বন্দুকের গুলি এসে তার কপাল ফুটো করে দিলে। মজিদ খাঁ মারা গেল।

মজিদ মারা গেলেও তার গোলা কিন্তু ব্যর্থ হয় নি, সেই গোলাতেই হার্মাদী জাহাজের বড় মাস্তুলটা ভাঙলো, একটা কামান উল্টে গেল, জাহাজে আগুন লাগলো।

সেই আগুনই বোম্বেটেদেরকে প্রকাশ করে দিলে, অমাবস্যার অন্ধকারের সুযোগ-সুবিধা আর রইল না।

বোম্বেটে জাহাজ থেকেও এবার কামান দাগলো।

কিছুক্ষণ চললো কামানের লড়াই।

মুনসীগঞ্জ থেকে নারায়ণগঞ্জ কতটুকুই বা পথ। সুবাদারী ফৌজ তৈরী ছিল, দেখতে দেখতে বরকন্দাজেরা ছোট ছোট ছিপ নিয়ে এগিয়ে এলো। তার পিছনে এলো নবাবী কোষা ছোট ছোট কামান নিয়ে। শত্রুপক্ষের জাহাজের সঙ্গে কাছাকাছি ও মুখোমুখি লড়াই করার পক্ষে ছোট কামান একান্ত উপযোগী। তাছাড়া ওজনেও হাল্‌কা, কামানের ভারে নৌকা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে না।

মোগল ফৌজের সঙ্গে ছোটখাটো লড়াইয়ে জয়ী হয়ে হার্মাদদের সাহস বেড়ে গিয়েছিল, তারা মুখোমুখি লড়াই করার জন্য এগিয়ে এলো। তারা কামান দাগলো। দু-ভাগ হয়ে নদীর দুই তীরের দিকে সরে গেল। জাহাজ থেকে কামান দাগবে আর সেই ফাঁকে সুযোগমত ডিঙ্গি নিয়ে তীরে উঠে লুঠপাট চালাবে।

কিন্তু হার্মাদদের হিসাবের ভুল হয়েছিল। তারা দু-ভাগ হতেই মোগলদের কোষাগুলি মাঝে এসে ঢুকলো। কোষার ছোট ছোট কামান থেকে দুপাশে গোলাবর্ষণ চললো। আর ছিপগুলি

কাছাকাছি এসে সুরু করলো বন্দুক চালাতে। জাহাজের ডেকে মানুষ নজরে এলেই ছিপ থেকে গুলি এসে তাকে ধরাশায়ী করে।

হার্মাদরা এতদূর ভাবেনি। লুঠ করতে এসে ছোটখাটো দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবে, দু-চারজন খুন-জখম হবে, এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল, এ ঠিক দু-চারজনের ব্যাপার নয়।

কোষার গোলবর্ষণে দেখতে দেখতে দুখানা জাহাজে আগুন ধরে গেল। হার্মাদরা এবার পিছুতে লাগলো।

হার্মাদরা জাহাজ চালাতে পাকা, কিন্তু বাঙালী মাঝি-মাল্লারাও কম নয়।

হার্মাদরা পিছু হটে যায়, সুবাদারী বরকন্দাজরাও এগিয়ে যায়।

ভোরের আগেই চট্টগ্রাম অবধি তাদের হটিয়ে দিয়ে দেশী ফৌজ ফিরে এলো। চট্টগ্রাম তখন আরাকানদের অধীনে, সেখানে চড়াও হতে হলে আরও ভালমতো তৈরী হয়ে যাওয়া দরকার।

সেই পরাজয় সামলাতে ক্যাপ্‌টেন গন্‌জালিশের বেশ কিছু সময় লাগলো।

যাক্ সে কথা, এদিকে গোলন্দাজ মজিদ খাঁর ছেলে মহম্মদ খাঁ ঢাকার সুবাদারের দরবারে এসে পিতৃ-পরিচয় দিয়ে চাকরি চাইল। সুবাদার বললেন—বরকন্দাজ কি সিপাহীর কাজ যদি করতে চাও, তো এখনি ভর্তি করে নিই।

মহম্মদ বললো—হুজুর, আমার বাপজান ছিল গোলন্দাজ, আমাকে গোলন্দাজী ফৌজে ভর্তি করে দিন। আমি বন্দুক আর কামান চালাতে শিখবো। ওই হার্মাদদের সঙ্গে আমি একটা বোঝা-পড়া করবো।

ফৌজদার বললেন—গোলন্দাজের ছেলে গোলন্দাজ হওয়া ভাল, কিন্তু তুমি তো নেহাৎ ছেলেমানুষ। আগে বরকন্দাজ হয়ে লড়াইয়ের কায়দা-কসরৎগুলি শেখো, শরীরটা আর একটু মজবুত হোক্ তবে তো কামান চালাবে!

মহম্মদ বললো—না হুজুর, আপনি গোড়া থেকেই আমাকে

গোলন্দাজে ভর্তি করে নিন্, আমি সব-কিছু সেইখান থেকেই শিখবো।

—কিন্তু প্রথমেই তো কাউকে গোলন্দাজ করা যায় না, নীচে থেকে উপরে উঠতে হয়। ভালমত দু-চার বার লড়াই করার পর তবে গোলন্দাজ হয়। গোলন্দাজের মাইনেও বেশী।

—আমার কোন মাইনে চাই না হুজুর, শুধু থাকবো আর খাবো, আর শিখবো। আমার বাপজানের মরণের বদ্‌লা আমায় নিতে হবে।

ফৌজদার বললেন—ঠিক আছে, তাহলে তো আর কারও কিছু বলার নেই।

ফৌজদার, মহম্মদ খাঁকে গোলন্দাজী ফৌজে ভর্তি করে নিলেন। মহম্মদ খাঁর বয়স তখন মাত্র ষোল বছর।

তারপর পুরো দুটি বছর মহম্মদ খাঁ শুধু বন্দুক আর কামান নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে। গোড়ার দিকে সে শুধু বন্দুকই চালিয়েছে। এমনভাবে সে লক্ষ্যভেদ আয়ত্ত করেছে যে আমগাছের পাকা আম, বলে বলে সে মাটিতে ফেলে।

তারপর লেগেছে কামান দাগার অভ্যাসে। কোন্ কামানের চোঙ্ কতটা লম্বা হলে, গোলাটা কতদূর অবধি যাবে সে তা জানে। সেই সীমার মধ্যে এক মিনিট তাগ্ করে সে গোলাটাকে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে।

বছর দুয়েক পরে একদিন গোলন্দাজ সর্দার কাল্লু খাঁ ফৌজদারকে বললো—মহম্মদ ছোকরা ওস্তাদ হয়ে গেছে হুজুর, ওর তাগ্‌বাগ্ দেখলে আমারই এখন অবাক লাগে। এই ছেলে বাপের নাম রাখবে।

ফৌজদার বললেন—তাহলে ওকে এখন মাইনে দিয়ে রাখতে পারি?

কাল্লু খাঁ বললো—ভালো বন্দুক ধরে হুজুর, ভাল কামান চালায়, কেন মাইনে দেবেন না? দু-বছর তো শুধু তালিম দিচ্ছে, এখন অবধি নিজে থেকে কোন কথা বলেনি।

—মুনসীগঞ্জে ওর বাবার জায়গায় একটা কামানদারী ওকে দাও।

—সেখানে সব কয়টা বুরুজেই তো কামানদার আছে হুজুর। যে নতুন স্লুপটা কাল জলে নামানো হয়েছে, তাতে তো দুটো কামান বসানো হবে, তারই একটায় ওকে বসিয়ে দিই।

—ডাঙ্গা থেকে একেবারে জলে? ছেলেমানুষ পারবে তো?

—আমার মনে হয় পারবে, হুজুর।

—ত হলে তাই লাগিয়ে দাও।

পরদিন থেকে মহম্মদ খাঁ এক নতুন স্লুপে মোতায়েন হয়ে গেল। বিশ দাঁড়ের ছোট স্লুপ, তিন মাস্তুলে ছোট ছোট তিনখানি পাল, আর সামনের দিকে পাটাতনের উপর একটি ছোট কামান। পাটাতনের নীচে এক রাশ গোলা।

কাল্লু খাঁ বললো—নতুন কামান তৈরী হচ্ছে, আরেকটা বসিয়ে দেব পিছনে গলুইয়ের পাশে।

মহম্মদ বললো—একটাই ঠিকমত চালাতে পারলে দশটার কাজ হয়, শুধু গোলার যোগান চাই। হালকা কামান্ যখন যেমন দরকার হবে মুখ ঘুরিয়ে নেবো।

—সব স্লুপেই দুটো করে কামান থাকে, সামনে একটা পিছনে একটা।

—তাহলে পিছনেও একটা রাখবেন, আমি থাকবো সামনেরটায়।

তিনদিনের মধ্যে গলুইয়ের পাশে আরেকটা কামান বসিয়ে স্লুপ বেরুলো নদীতে টহলদারী করতে।

পুরো দুটো বছর মহম্মদ খাঁ সেই স্লুপেই রইল। সামনের কামানটাই যেন তার সব। দিনে কামানটির পাশেই শুয়ে থাকে, রাতে কামানটার গায় ঠেস দিয়ে বসে বসে ঝিমোয় আর মাঝে মাঝে চোখ মেলে দিগন্তের পানে।

রাতে কোন জাহাজের আলো নজরে পড়লে আর রক্ষা নেই। মহম্মদ সঙ্গে সঙ্গে গোলা নিয়ে তৈরী হয়, হাঁক দেয়—সামনে বাত্তি, হুঁশিয়ার।

স্লুপ আলোর দিকে এগিয়ে যায়, মহম্মদ কামান দাগে। সামনের জাহাজ দু-তিনটে গোলা না খেয়ে পালাতে পারে না। সবাই যে পালাতে পারে তা-ও নয়, আগুন লেগে যায়। কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত নদীর বুকে আগুনের লাল ঝিলিক দেখিয়ে জাহাজ তলিয়ে যায়। কাল্লু খাঁ পিঠ চাপড়ে বলে—সাবাস বেটা! বহুৎ বাহাদুর!

॥ তেরো ॥



মহম্মদের কৃতিত্ব চর-আমানুল্লার ব্যাপারে।

কাল্লু খাঁ মেয়ের বিয়ে দিতে কয়েকদিনের জন্য গ্রামে চলে গেল ; স্লুপের ভার দিয়ে গেল, মহম্মদের উপর, বললো—মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলবি, গোলযোগ বাধিয়ে স্লুপখানা যেন খোয়াস্ না, তাহলে ফৌজদারের কাছে আমার বদনাম হয়ে যাবে।

স্লুপের কর্তা হয়েই মহম্মদের মাথায় এক বদ্‌খেয়াল চাপলো। নদীর মধ্যে তারা টহলদারী করছে, কিন্তু সাগরের মুখের চরগুলোয় তো দিব্যি বোম্বেটেরা আস্তানা করে বসে আছে। ওই চরগুলো থেকে ওদেরকে হাটিয়ে দেওয়া যায় না?

বাহির-দরিয়ায় যাবার মুখেই হাতিয়া ও সন্দীপের আগে পড়ে চর-আমানুল্লা। ক্যাপটেন গনজালিশের মতো আর এক বোম্বেটে সর্দার এখানে আস্তানা করেছে কিছুদিন ধরে, তার নাম শোনা যায় —ক্যাপটেন রডারিক। তার লোকজন কম, জাহাজও বোধ হয় একখানা, গনজালিশের মতো সে বেপরোয়া নয়। সাবধানে সুবিধামত সে ডাকাতি করে, থলি থলি টাকা নিয়ে এসে সে কাঠের সিন্দুকে বোঝাই করে। মানুষ ধরে চালান দেবার তার কোন

আগ্রহ নেই। কোন কোন দুঃসাহসী জেলে রাতের অন্ধকারে সব দেখেশুনে এসে ফৌজদারকে এসব বলে গেছে। অবশ্য এজন্য ফৌজদার তাদেরকে রীতিমত বকশিস দিয়েছেন। তারা আরো জানিয়ে গেছে যে রডারিকের দলে পঁচিশ-ত্রিশ জনের বেশী মানুষ নেই।

মহম্মদ মতলব করলো এই রডারিকের দলটাকে ঘায়েল করে বাহাদুরী দেখাবে। রাতের অন্ধকারে একদিন সে চর আমানুল্লার দিকে পাড়ি জমালো।

স্লুপের পিছনে একটা ডিঙ্গি বাঁধা ছিল, স্লুপ দূরে রেখে সেই ডিঙ্গি নিয়ে নিঃশব্দে মহম্মদ চরে গিয়ে উঠলো। রাত তখন এক প্রহর পার হয়ে গেছে। রডারিকের দল সেদিন জাহাজ নিয়ে বেরোয় নি, ছোট কয়েকটা তাঁবুর পাশে পাশে বসে, আগুনে মাংস ঝলসাচ্ছে, সামনে কলসী কলসী তাড়ি। আশেপাশে কোনদিকে তাদের তখন খেয়াল নেই।

ভাল করে সব-কিছু দেখে নিয়ে মহম্মদ ডিঙ্গি নিয়ে ফিরে এলো।

রডারিকের জাহাজ নোঙর করা ছিল, একটা লণ্ঠন জ্বলছিল মাস্তুলে। মহম্মদ ডিঙ্গি নিয়ে গেল সেই জাহাজের গায়ে, জাহাজের ঝোলানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল জাহাজের উপর। খুব সন্তর্পণে পায়ে পায়ে সে এগোচ্ছিল, তারপর তার ভয় ভেঙে গেল, একটা মানুষও নেই সেই বোম্বেটে জাহাজে। দুদিকে দুটো নোঙর করা আছে, মোটা পাটের কাছি। মহম্মদ-ছুরি দিয়ে কাছি কাটলো। তারপর সেই কাছি জাহাজের হালের সঙ্গে বেঁধে, স্লুপে নিয়ে গেল। তারপর বিশদাঁড়ের স্লুপ সোজা পাড়ি জমালো মুনসীগঞ্জের দিকে।

ভোরের আলোয় মুনসীগঞ্জের মানুষ ঘাটে বোম্বেটে জাহাজ দেখে অবাক হয়ে গেল।

মহম্মদ নিজে গেল ফৌজদারের কাছে। ফৌজদার ছুটে এলেন, দেখে শুনে বললেন—সাবাস বেটা, এই জাহাজখানা আমি তোকেই দিলাম, মনের মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে নে।

মহম্মদ বললো—এই জাহাজ আপনি আমার ওস্তাদকে দিন,

আমার ওই স্লুপই ভাল, ওর চালচলন সব আমার জানা, আমায় যদি মনোমত চলাফেরা করার হুকুম দেন তাহলে আমি বাহির-দরিয়ায় সুবিধামত এক একখানা তুষমণি জাহাজ খতম করতে পারি।

—অই বিশদাঁড়ী স্লুপেই তুমি বোম্বেটেদের সঙ্গে লড়ে পারবে?

—খোদাতালার মেহেরবাণী থাকলে সব পারবো হুজুর। হুজুরের হুকুম আর খোদাতালার মেহেরবাণী।

—বেশ, বাহির দরিয়া অবধি তুমি খুসিমত চলফেরা করবে, কোন বাধা নেই, তবে জান বাঁচিয়ে চলবে, স্লুপ আর সওয়ার দুই যেন বজায় থাকে!

মাথা নামিয়ে মহম্মদ ফৌজদারকে কুর্নিশ করে বিদায় হয়েছিল।

তার পর সেই রাত্রেই মহম্মদ স্লুপ নিয়ে আবার চর-আমানুল্লায় হানা দিয়েছিল। ঘাটে একখানাও ডিঙ্গি দেখতে পায় নি, চরে উঠে দেখতে পায় নি একজন মানুষকেও। আটটা তাঁবু খাটানোই ছিল, আর ছিল কিছু বাসনকোসন ও একটা কাঠের বড় সিন্দুক, ডিঙ্গিতে নিয়ে যাবার সুবিধা হয় নি বলেই হার্মাদরা রেখে গেছে। মহম্মদ তাঁবু আর সিন্দুক স্লুপে তুলে নিলে।

পরদিন সকালে তাঁবু আর সিন্দুক দেখে ফৌজদার তো অবাক। তখনই সিন্দুক খুলিয়ে দেখলেন—শুধু টাকা আর টাকা। গুনিয়ে দেখলেন—দশ হাজার টাকা।

ফৌজদার বললেন—এসব লুঠ করা টাকা। তুমি চোরের উপর বাটপারি করে এসেছ। এ থেকে তুমি যা নিতে চাও নিয়ে নাও, বাকিটা সেরেস্তায় জমা করে দিই।

মহম্মদ বললো—ওই টাকায় আমার দেশের অনেক মানুষের রক্ত লেগে আছে হুজুর, ওর একটাও আমি নেবো না। আমি শুধু আপনার কাছে একটা আরজি রাখতে চাই, এই টাকা দিয়ে আপনি শুধু হাতিয়ার বানিয়ে দিন, হার্মাদদের সঙ্গে যাতে আমরা ভালমত লড়তে পারি। আমরা লুঠ-তরাজের খুন-জখমের বদ্‌লা চাই।

ফৌজদার বললেন—বেশ, তাই হবে।

এই ছোকরার কোন লোভ নেই, বুদ্ধি আছে, সাহসও আছে, আর আছে গুলিগোলা চালানোর নৈপুণ্য। ছেলেটিকে ফৌজদারের ভাল লাগে। নবাবী ফৌজে এই জাতের মানুষ যত আসবে ততই ফৌজের জোর বাড়বে। ফৌজদার বললেন—তুমি জাহাজ ধরে আনলে এতো টাকা, একপয়সা বকশিস নিলে না, তোমার স্লুপের লোকজন-দের একটু মণ্ডা-মিঠাই খাইয়ে দাও। আজ তাদেরকে রান্না করতে বারণ করে দিও, আমার বাড়ী থেকে আজ তোমাদের খানা যাবে।

ঘণ্টা তিনেক পরে ফৌজদারের বাড়ী থেকে স্লুপের কুড়ি-বাইশজন লোকের জন্য যে খাবার এলো—কালিয়া পোলাও দরবেশ ও দই, দুবার খেয়েও জোয়ানরা তা শেষ করতে পারলো না।

সেইদিন থেকেই স্লুপের নায়ক হলো মহম্মদ খাঁ।

হার্মাদ ও মগদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে, মহম্মদ স্লুপের নাম দিল—'ডাকাতিয়া'। পটুয়া ডাকিয়ে গলুইয়ের দুপাশে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়ে নিল নামটা।



॥ চোদ্দ ॥

তারপর দু-বছর কেটে গেছে।

মহম্মদ এর মধ্যে বোম্বেটেদের সঙ্গে একটা লড়াইও করেনি। বলে—বিশ-বাইশজন লোক নিয়ে কি মুখোমুখি লড়াই চলে? আমার লড়াই বুদ্ধির লড়াই—দুষমণকে কম্‌জোরি করা।

মহম্মদ রাতের অন্ধকারে স্লুপ নিয়ে ঘুরতো। স্লুপের পিছনে বাঁধা থাকতো একখানা খড়বোঝাই ডিঙ্গি। নজর রাখতো কোন হার্মাদী জাহাজ নদীর কিনারায় ভিড়েছে কিনা। তেমন কিছু চোখে পড়লে, চুপ করে আড়ালে অপেক্ষা করতো, তারপর যখন গ্রাম থেকে চীৎকার ভেসে আসতো, কোন ঘরে আগুন জ্বলে উঠতো, তখন তিন-

চার জন ডিঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যেতো হার্মাদী জাহাজের পিছনে। ডিঙ্গি ভেড়াতো জাহাজের গায়ে। ঝুলানো কাছি বেয়ে উঠে যেতে উপরে। নৌকা থেকে খড়ের আঁটি দড়ি বেঁধে তুলে নিয়ে ফেলতো জাহাজের খোলে, হার্মাদী জাহাজে কামান দাগার জন্য অনেক ঘুলঘুলি থাকে, তার ভিতরে খড় ঠেসে দিয়ে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে নেমে আসতো ডিঙ্গিতে।

হার্মাদী জাহাজের ডাকাতের দল তো তখন লুঠ করতে নেমে গেছে। দু-চারজন যদি জাহাজে থাকে, আছে তারা ছাদের উপর, নজর তীরের দিকে। লুঠ-তরাজের অবস্থাটা তারা দেখতে চাইছে। আর মহম্মদের দল এতো-কিছু করে যাচ্ছে নিঃশব্দে, তীরের উল্টোদিকে। জাহাজের উপরের মানুষ কেউ টের পাচ্ছে না। তারা তো তাড়ি খেয়ে কেমন লুঠ হচ্ছে, কত টাকা লুঠ হবে, সেই ভাবনায় মশগুল।

জাহাজের লোকের চৈতন্য হয় তখন যখন জাহাজে আগুন লেগে ধোঁয়া উঠতে সুরু করে।

কাঠের তৈরী জাহাজ, একবার আগুন লাগলে দু-চার জনে সে আগুন নেভানো যায় না। তাছাড়া কামানের গোলা ও বন্দুকের গুলি যে দিকটায় থাকে, আগুনটা কোনরকমে একবার সেদিকে পৌঁছালে তো আর কথা নেই।

জাহাজে আগুন দেখলেই হার্মাদরা লুঠতরাজ জের ছেড়ে ছুটে আসে। লুঠের মাল ঘাটে ফেলে তারা ডিঙ্গি নিয়ে ছুটে আসে জাহাজে, কিন্তু তখন আর করার কিছু থাকে না। জাহাজের গুলি গোলা তখন ফাটতে সুরু করেছে।

জাহাজ অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়। নদীর জলে কয়েকটা আধপোড়া ভাঙা কাঠের তক্তা ছাড়া আর কিছু থাকে না।

এইভাবে দু-তিনখানা জাহাজ খতম করার পর মহম্মদ এক একবার ফৌজদারের দরবারে যায়, সেলাম দিয়ে বলে—হুজুর, খুন-জখম নেই, গুলিগোলার খরচ নেই, খরচ শুধু শুধু কয়েক তল্পা খড় আর চক্‌মকি।

গত দু-বছরের মধ্যে এইভাবে অন্ততঃ বিশখানা জাহাজ মহম্মদ খতম করেছে।

ফৌজদার তার উপর বড় খুসি। বলেন —বখশিস তো নিবি না, খানা-পিনা করে যা—

ফৌজদারের রসুইখানা থেকে সুলুপের সবার জন্য পোলাও কালিয়া দরবেশ আর দই আসে।

নবাবী নাওয়ারা ফৌজে মহম্মদ এখন নামকরা নায়েক।



॥ পনেরো ॥

এদিকে ক্যাপটেন গনজালিশ সন্দীপে ঘাঁটি করে পাকাপাকি-ভাবে বসে গেছে। তাদের দৌরাত্মেও বাহিরদরিয়ার মুখ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। কোন সদাগরী জাহাজ আর ভরসা করে বার-সমুদ্রে যেতে চায় না।

মহম্মদ দূর থেকে সন্দীপের উপর নজর রাখে, কিন্তু কিছুদিন যাবৎ হার্মাদী জাহাজের ঘোরাফেরা আর নজরে আসছে না। যত জাহাজ আসছে, সব নোঙর করছে সন্দীপে। সন্দীপের কাছে অনেক হার্মাদী জাহাজ জমেছে।

গনজালিশ তাহলে এবার নতুন কোন মতলব করেছে।

মহম্মদকে ফৌজদার বললো —এ খবর আমি আগেই পেয়েছি। ওরা একটা বড় লড়াইয়ের জন্য তৈরী হচ্ছে, আমাদের নৌবহর আর কয়েক দিনের মধ্যেই হাতিয়ায় গিয়ে ঘাঁটি করবে। তুমি নজর রাখো, এর মধ্যে নতুন কিছু খবর পেলেই জানাবে।

মহম্মদ সেই রাতেই চর-আমানুল্লায় এসে উঠলো।

এই জঙ্গলে বাঘ-ভল্লুকের ভয় নেই, তবে সাপের ভয় আছে, অনেক সময় দু-চারটে কুমীরও ডাঙায় উঠে আসে। কয়েকটা

নারিকেল গাছের মাঝে খানিকটা জায়গা তারা পরিষ্কার করে নিলে। দিনে সেইখানে ক-জন থাকে, পালা করে এক একজন গাছে উঠে বসে থাকে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই স্লুপে ফিরে যায়।

এইভাবেই কয়েকদিন কাটলো, কিন্তু নবাবী নৌ-বহরের দেখা মিললো না, ওদিকে হার্মাদী জাহাজও সন্দীপ থেকে বেরুলো না।

তারপর একদিন গাছে-চড়া মাল্লাটি সকালেই হাঁক দিল, —হার্মাদী বহর রওনা হয়েছে—পশ্চিম দিক ধরে ভিতরে ঢুকেছে···অনেকগুলো···সারি সারি পাল···তিন—পাঁচ—আট—নয়—দশ—আরো আছে নজরে আসছে না, অনেক পিছনে দু-খানা ···আরও পিছনে একখানা···সব উত্তরমুখো—গাঙের ভিতরে ঢুকছে—

আরো ঘণ্টাখানেক লোকটি গাছের মাথায় বসে রইল কিন্তু আর কিছুই দেখতে পেলে না। সে গাছ থেকে নেমে এলো।

মহম্মদ বললো—আজ আর গাঙের ভিতর যাওয়া ঠিক হবে না। আজ আমরা সন্দীপটা একবার ঘুরে দেখে আসবো। গাঙে ঢুকলেই আজ হার্মাদদের নজরে পড়তে হবে।

সারাটা দুপুর ঘণ্টায় ঘণ্টায় গাছের উপর লোক বদল হলো, কিন্তু নীচে জল আর উপরে আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। একখানা ডিঙ্গি অবধি কোথাও নেই।

বিকাল বেলা স্লুপ নিয়ে মহম্মদ বেরিয়ে পড়লো। হাওয়ার জোর ছিল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তারা সন্দীপের কাছে চলে এলো।

এবার মহম্মদ নিজেই উঠে গেল মাস্তুলের উপর। নজরে এলো একখানা জাহাজ, আর অনেক মানুষ।

মহম্মদ মাস্তুল থেকে নেমে এলো, বললো—ওখানে অনেক লোক, বোধ হয় একটা গড় তৈরী করছে। বেশী কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। জাহাজ থেকে কামান দাগতে পারে।

দু-দিন চুপচাপ চর-আমানুল্লাতেই কাটলো।

তৃতীয় দিন সকালবেলা বলরাম এলো হার্মাদী জাহাজ নিয়ে।

বলরামের সঙ্গে আলাপ করে মহম্মদ খাঁ খুসি হলো, এ ঠিক তার মনের মতো মানুষ। বয়সেও প্রায় সমবয়সী।

বলরাম হলো মহম্মদের সঙ্গী ও সহযোগী।



॥ ষোলো ॥

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় মহম্মদ ডাকাতিয়া নিয়ে রওনা হলো, বললো—সন্দীপের হালচালটা রাতের অন্ধকারে একবার দেখে আসি। আগে থেকে সব জানা থাকলে বাদশাহী ফৌজদারের সুবিধা হবে।

বলরাম মহম্মদের পাশেই রইল। মহম্মদ হাল ধরলো, পাশেই একটা ছোট কামানের গায়ে হেলান দিয়ে বসে রইল বলরাম। হাওয়া ছিল অনুকূল, তিনটে পাল তুলে দিয়ে ডাকাতিয়া পূর্বমুখে ছুটলো। কোথাও কোন আলো নেই, অন্ধকারে কালো নদীর বুকে একটা কালো বিন্দু এগিয়ে চললো।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কয়েকটা মিটমিটে আলো দেখা গেল দূরে, মহম্মদ হাঁক দিল—পাল নামাও, আমরা এসে গেছি।

আরো কাছে গেলে আরো ভাল বোঝা গেল, ওদিকে তখন চাঁদ উঠেছে। দ্বীপের গাছপালার ছায়াটা অস্পষ্ট। মিটমিটে আলোগুলো জোরালো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মহম্মদ বললো—ওরা বোধ হয় রান্না করছে, ওসব চুল্লীর আগুন। ওখানে এখন যারা আছে সবই কি তোমাদের দলের মানুষ?

বলরাম বললো—এই দু-তিন দিনের মধ্যে নতুন কিছু না ঘটে থাকলে ওই দ্বীপ ইয়াকুবেরই দখলে আছে বলা চলে।

—নতুন কিছু ঘটার মতো তো দেখছি না। হার্মাদরা সব তো চলে গেছে। একখানা জাহাজ ছিল, তুমি তো সেখানা টেনে নিয়ে গিয়েছ, কিছু ঘটলে তো ওদের জাহাজ দেখা যাবে।

—আমি সেইটাই দেখছি।

—ঘাটে জাহাজ থাকলে কি আলো থাকতো না?

—ডাকাতের দল, অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে থাকাই ওদের অভ্যাস।

একখানা মেঘে কয়েক মিনিটের জন্য চাঁদ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, সেই মেঘ সরতেই সহসা দেখা দিল একখানা মস্ত জাহাজ। জ্যোৎস্না ফুটতে আর একটু দেরী হলেই ডাকাতিয়া একেবারে জাহাজখানির গায়ে গিয়ে পড়তো। বলরাম সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলো, হাঁক দিল—হুঁসিয়ার।

মহম্মদও দেখেছিল, 'সামালো'—বলে হালের উপর ঝুঁকে পড়লো। ডাকাতিয়া এক ঝটকায় খানিকটা কাত্ হয়ে একেবারে ঘুরে গেল।

সামনের জাহাজ থেকে তৎক্ষণাৎ সাড়া উঠলো—সামাল যাও!

ডাকাতিয়া কোন সাড়া দিল না।

সামনের জাহাজ থেকে এবার হাঁক পড়লো—নাও সামালো—

ডাকাতিয়া তখন দ্রুত সরে যাচ্ছে, কেউ কোন সাড়া দিল না।

—রুখ্ যাও!

নিঃশব্দে ডাকাতিয়া ছুটলো। কামানের নাগালের বাইরে অন্ধকারে ডাকাতিয়া তখন হারিয়ে যেতে চায়। কামান দাগতেও তো সময় লাগবে।

কিন্তু সে অবকাশ ডাকাতিয়া পেল না। হার্মাদী জাহাজখানা বোধ হয় তৈরী ছিল। ওদের ছাদে একটু চীৎকার শোনা গেল, তারপরেই ছাদের উপর আগুন দেখা গেল, তারপর দুটি গোলা এসে পড়লো ডাকাতিয়ার দু'পাশে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানিও এগিয়ে আসতে সুরু করলো। বাতাসে চীৎকার ভেসে এলো—নাও রোখো—

আবার সামনের দিকে জলে পড়লো দুটি গোলা।

আর তো এগিয়ে যাওয়া চলে না, মহম্মদ হাঁক দিল,—দাঁড় থামাও!

ডাকাতিয়া থেমে গেল।

বলরাম বললো—কি করবে এখন?

মহম্মদ বললো—ডাকাতিয়া রক্ষে করতে চাই।

—রক্ষে তো হবে না, ওদের হাতে পড়বে।

—আমি ডাকাতিয়া ছেড়ে যাবো না।

—ডাকাতিয়া যাবে, তুমিও জান খোয়াবে। কি হয় দেখি—এটা কোন কাজের কথা নয়। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে বলে। যদ্‌ভবিষ্য বিনশ্যতি। কি হয় দেখি মানে—মৃত্যু!

মহম্মদ বললো—আমি তো হিন্দু নই, আমি যদি মরি তো ডাকাতিয়া নিয়েই মরবো, আর যদি বাঁচি তো ডাকাতিয়া নিয়েই ফিরবো।

জাহাজের ছাদে এবার দু'টো মশাল দেখা দিল। জাহাজখানি কাছে এগিয়ে এলো।

ডাকাতিয়া সলুই, কিনারা অনেক নীচু, হার্মাদী জাহাজের ছাদ অনেক উঁচুতে। ছাদের কিনারায় দুটি মশাল দেখা দিল, আর কয়েকজন মগ। একজন ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে—সলুই কার?

মহম্মদ জবাব দিল—ক্যাপটেন ডি-সুজা সাহেবের—হার্মাদী সলুই।

—তুমি কে?

—এই সলুইয়ের সর্দার মাল্লা। রাতের টইলদারি করতে বেরিয়েছি।

—তোমাদের ক্যাপটেন গনজালিশ সাহেব আছেন এখানে?

—না, তিনদিন হলো তিনি বহর নিয়ে বেরিয়েছেন নবাবী ফৌজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার জন্য। এখানে শুধু ডি-সুজা সাহেব আছেন।

—বেশ, তুমি আমাদের জাহাজঘাটায় নিয়ে চল। এতক্ষণ তোমরা কোন সাড়া দাও নি কেন? এখনি তো গোলার মুখে তোমরা খতম হয়ে যেতে।

—ভেবেছিলাম নবাবী বহরের জাহাজ, তাই চুপ করে ছিলাম।

—ঠিক আছে, লণ্ঠন জ্বেলে আগে চল। আমরা জাহাজ ভেড়াবো।

—যো হুকুম, হুজুর!

মহম্মদের নির্দেশে দাঁড়ীরা আবার দাঁড় ধরলো, সলুই সরে এলো জাহাজের কাছ থেকে। একজন দাঁড়ী একটা লণ্ঠন্ জ্বেলে ঝুলিয়ে দিল একটা মাস্তুলের উপর।

মহম্মদ এবার বলরামের পানে তাকিয়ে বললো—কি বুঝলে?

বলরাম বললো—চমৎকার!

—এবার তুমি আমাকে বাতলে দাও দিকি, কোথায় ওদের জাহাজ ভেড়াতে বলবো।

—রাতে ঠিকমতো ঠাহর পাবো কিনা জানি না, তবে চলো দেখি—

কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাকাতিয়া সন্দীপের কিনারায় পৌঁছে গেল। বড় মাস্তুলটার সঙ্গে একটা দড়ির সিঁড়ি ঝোলানো ছিল, তারই কয়েকটা ধাপ উপরে উঠে গিয়ে বলরাম ভাল করে ঠাহর করতে লাগলো, চাঁদের আলোয় ভালমত ঠাহর না পেলেও পুরানো জায়গা চিনতে কষ্ট হলো না। ঠিকমত জায়গায় এসে বলরাম বললো—এইখানে ভেড়াও! এখানেই একটা খাঁড়ি আছে।

ডাকাতিয়া থামলো।

পিছনেই মগ জাহাজটি আসছিল। মহম্মদ সাড়া দিল—রোখ্‌খো—

মহম্মদ হাঁক দিল—কাপ্‌তান হুজুর! এখানে নোঙর করুন, এইটাই জাহাজ-ঘাটা।

ছাদ থেকে নোঙর নামাবার সাড়া শোনা গেল।

মহম্মদ আবার হাঁকলো—হুজুরের সঙ্গে কথা আছে, উপরে যাবো?

—সিঁড়ি ঝুলানো আছে, উঠে এসো।

—সিঁড়ি বেয়ে মহম্মদ তরতর করে উপরে উঠে গেল। সামনেই ঝকঝকে টুপি মাথায়, কোমরবন্ধে ছোরা ঝুলানো একটি লোককে দেখে এক কুর্নিশ করে বললো— হুজুর, ডিসুজা সাহেবকে ঠিকমতো বোঝাতে আমার অনেক সময় লাগবে। হয়তো আমার ফিরে আসতে রাত দুপুর হয়ে যাবে। তাই আমি একটা কথা বলি হুজুর, আজ রাতে আপনাদের জাহাজ থেকে নামার দরকার নেই। তাছাড়া রাতে এদিকটায় সাপের ভয়ও আছে।

মগ ক্যাপটেন ক্ষণেক চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন— ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, তখন সেই ব্যবস্থাই থাক্।



॥ সতেরো ॥

ইব্রাহিম ডাকাতিয়ার লণ্ঠন আগেই দেখতে পেয়েছিল, ঘাটের মুখে এসে সে অপেক্ষা করছিল। বলরাম মহম্মদকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটে এসে উঠলো। ইব্রাহিমের সঙ্গে মহম্মদের পরিচয় দিল।

ডাকাতিয়ার দাঁড়ী-মাঝিরাও নামলো।

প্রথমে কথা হলো মগদের নামিয়ে নিয়ে এসে বন্দী করা। কিন্তু জাহাজে অন্ততঃ পঞ্চাশ-ষাটজন মগ আছে, সবাই তো নামবে না, জাহাজখানা দখল করতে গেলে তখন তাদের সঙ্গে একটা মারামারি করতে হবে। সে লড়াইয়ে এদিকের কিছু মানুষ ঘায়েল হবে, কারণ এদের মধ্যে সৈনিক তো কেউ নেই। যদি মগেরা সংখ্যায় বেশী হয় তাহলে তো তারা জাহাজ নিয়ে সহজেই সরে পড়বে। খানিকটা দূরে সরে গিয়ে কামান দাগতেও পারে। অতো ঝামেলার ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে জাহাজ সমেত সবগুলোকে ঘায়েল করাই ভাল এবং তা করতে হবে আজ রাত্রেই।

মহম্মদ বললো—এ কাজের ভার আমিই নিলাম, আমার কাজের যোগ্য লোক আছে।

তখনই মহম্মদ ডাক দিল—হনুমান মাল্লা, একবার এদিকে এসো—

একটু তফাতে ডাকাতিয়ার মাঝিমাল্লারা বসে তামাক ফুঁকছিল, তাদের মধ্যে একজন উঠে এলো। ছিপ্‌ছিপে একহারা চেহারার এক জোয়ান। মহম্মদ বললো—একে তোমরা চিনে রাখো, আমার দলে এমন কসরৎ-জানা মানুষ আর একটিও নেই। এর আসল নাম কাল্লু, কিন্তু আমরা সবাই একে ডাকি হনুমান সিং বলে।

হনুমানকে কাছে বসিয়ে মহম্মদ বললো—হনুমান সিং, রাত দুপুরে আমার সঙ্গে ছিপ নিয়ে বেরুতে হবে।

হনুমান বললো—বেশ যাবো—

কি করতে হবে মহম্মদ হনুমানকে সেই নির্দেশ দিল।

বলরাম সব বসে বসে শুনছিল, কথা শেষ হলে বললো—এতো ছুটোছুটি করার কোন দরকার নেই। এখন শুক্লপক্ষ চলছে, রাত তিন প্রহরেই চাঁদ অস্ত যাবে, তখনই আমরা কাজ হাঁসিল করবো, কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না। শেষ রাতে জাহাজের সবাই ঘুমুবে, যারা পাহারাদারি করবে তারাও বসে ঝিমুবে, আমরা নিঃশব্দে কাজ সেরে সরে আসবো। গোটা ছয়েক কাঠের ভেলা হলেই হবে। আমাদের কাঠের অভাব নেই। দড়ি দিয়ে বেঁধে নিতে যা সময় লাগবে। খড়ও অঢেল, নাহলে একখানা চালা ভেঙে নেবো।

বলরাম তখন কি করতে হবে, একে একে বলে গেল।

ইয়াকুব বললো—এতে কোন ঝুঁকি নেই।

মহম্মদ বললো—তবে তাই কর।

আস্তানার এক দিকে অনেক কাঠ জড়ো করা ছিল, চেলাই করে রান্নার কাজে লাগানো হয়। খালাসীরা এবার সেই সব কাঠ দড়ি দিয়ে বেঁধে ভেলা তৈরী করতে বসে গেল। প্রহর খানেকের মধ্যে বড় বড় ছ'টা ভেলা তৈরী হলো। তারপর এক একটি ভেলাকে

জলে ভাসিয়ে তার উপর স্তূপাকার খড় বোঝাই করা হলো। ডাকাতিয়ার দু'পাশে দু'খানি ছিপ বাঁধা ছিল, সেই ছিপ দু'খানির সঙ্গে তিনটে করে ভেলা বেঁধে দেওয়া হলো। তারপর সবাই তীরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো, চাঁদ কখন অস্ত যাবে।

দেখতে দেখতে চাঁদ অস্ত গেল, বলরাম ও মহম্মদ দু'খানি ছিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো, এক একখানি ছিপের পিছনে তিনটি করে খড় বোঝাই ভেলা।

হনুমান একটি মস্ত কাছি নিয়ে আগেই বেরিয়ে গেল, কাছির একটা মুখ জাহাজের হালে বেঁধে, জাহাজের গা ঘেঁসে কাছি ঘুরিয়ে এনে আরেক মুখও হালে বাঁধলো। তারপর পর পর তিনটি করে ভেলা জাহাজের এক এক পাশে সেই কাছির সঙ্গে এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হলো, যেন জলের টানে কোন মতেই ভেলাগুলো ভেসে না যায়, জাহাজের গায় লেগে থাকে।

এবার দু'টি ছিপে দু'টি ছোট ছোট মশাল জ্বালা হলো, জাহাজের দু'পাশে গিয়ে পর পর তারা খড়ের ভেলায় আগুন লাগিয়ে দিল। নদীর ঝড়ো হাওয়ায় খড়ের গাদা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

যত হাওয়া বয়, ততো আগুন জ্বলে, জ্বলতে জ্বলতে জাহাজখানা নদীর জলে মিশে গেল।

ছিপ দু'খানি যখন ফিরে এলো ঘাটে, পূবের আকাশ তখন ফরসা হচ্ছে।



॥ আঠারো ॥

মগ জাহাজ বানচাল হলো। জাহাজে যারা ছিল, তাদের কেউ কেউ আগুনে পুড়ে মরলো, অনেকে বেপরোয়া জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। পড়ার সময় কেউ কেউ কিছু আহত হলো। তারপর মেঘনার খরস্রোতে ভেসে গেল।

জাহাজের সারেঙ ছিল শক্তসমর্থ মানুষ। সে গোড়াতেই জলে পড়েছিল, নোঙরের কাছিটা ধরে সে জাহাজখানির শেষ অবধি দেখলো। জাহাজ যখন টুকরো টুকরো হয়ে গেল তখন সে বড় একখানা বাহাদুরি কাঠ ধরে স্রোতে গা ভাসালো।

দুপুর বেলা একখানি জেলে ডিঙি তাকে তুলে নিলে। সন্ধ্যাবেলা সারেঙ পৌঁছালো চট্টগ্রামে। চট্টগ্রাম তখন আরাকান রাজের দখলে।

আরাকান সেনাপতি মেংরাজগী তখন চট্টগ্রামে নাওয়ারা বহর সমবেত করেছে, মেঘনার পূর্বতীর ধরে তারা এবার বরাবর বাংলা-দেশের ভিতরে ঢুকবে। পর্তুগীজদের সঙ্গে তাদের একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে, তারা যা কিছু লুঠতে চায় লুঠবে মেঘনার পশ্চিম তীরে, পূর্ব তীরে আরাকানী রাজের সত্ব। পর্তুগীজদের সঙ্গে তারা এক-সঙ্গেই বেরুবে, নবাবী ফৌজ দুদিকে সামাল দিতে পারবে না। আর ভুঁঞা রাজাও সবাই শেষ হয়ে এসেছে, তাদের আগের দাপট নেই। প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায়, কংস নারায়ণ, মুকুন্দ রায় কেউ তো আর নেই। এই সময় ত্রিপুরার সীমান্ত অবধি দখল করে নেবার কোন অসুবিধা নেই।

গনজালিশ কবে নাগাদ অভিযান সুরু করবে সেই কথা জানার জন্যই মেংরাজগী এক কাপ্তানকে পাঠিয়েছিলেন সন্দীপে। সেই জাহাজের সারেঙ ফিরে এলো জেলেডিঙ্গিতে, বললো—গনজালিশ দু'দিন আগেই বেরিয়ে পড়েছে। দ্বীপে যাদের রেখে গেছে, তারা জাহাজ থেকে নামতে দেয়নি, উপরন্তু রাতে জাহাজ জ্বালিয়ে দিয়েছে। জাহাজে যারা ছিল, সবাই ভেসে গেছে।

মেংরাজগী কয়েকমিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন—হার্মাদদের কথায় বিশ্বাস রাখা চলে না, ওরা নিজের সুবিধামত কাজ করে।

তখনই তিনি সব ক'জন নৌ-দারোগাকে ডেকে পাঠালেন, বললেন —সন্ধ্যার পরেই আমরা রওনা হবো, আজ রাতেই সন্দীপ দখল করতে হবে। হার্মাদরা লুঠতে বেরিয়েছে, এই সুযোগ।



॥ উনিশ ॥

উষার আলো ফোটার আগেই বলরামের ঘুম ভাঙে। সূর্য প্রণাম করে যখন সে ভালভাবে সামনে তাকালো তখনই তার নজরে পড়লো নবারুণের রক্তিম আভায় লাল সূর্যের নীচেই পূর্ব দিগন্তে কয়েকটি কালো বিন্দুর একটি সারি। বিন্দুগুলি ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে। এই বিন্দুর সারি বলরাম চেনে। আরও কয়েক লহমা ঠাহর করে বলরাম জল থেকে উঠে এলো।

আস্তানায় এসে মহম্মদ ও ইয়াকুবকে ডেকে তুললো, বললো—তৈরী হয়ে নাও, পূর্বদিক থেকে আরাকানী বহর আসছে।

ইয়াকুব ও মহম্মদ তখনই নদীর তীরে ছুটে গেল। খানিক বাদে ফিরে এসে বললো—পুরো একটা নৌবহর আসছে। গুণলাম পনেরোখানারও বেশী জাহাজ, পিছনে আর ঠাহর হলো না।

বলরাম বললো—ওরা এগিয়েই আসছে। আমরা কি করবো তা আমাদের এখনি ঠিক করে ফেলতে হবে।

ইয়াকুব বললো—লড়াই করে আমরা পারবো না, আমাদের মাত্র দশটা কামান আছে, তাতে অতোগুলো জাহাজের সঙ্গে আমরা সামাল দিতে পারবো না। খোলা জায়গায় আমাদের সবাইকে এখানে মরতে হবে। আমরা এখানে দু'শো জনের বেশী বন্দী আছি, এতোগুলো মানুষ এখনি কোথায় সরে যাবে? সে নৌকাও তো আমাদের নেই। আমাদের কোনরকম একটা আপোস-রফায় আসতে হবে।

মহম্মদ বললো—মগেরা কোন আপোস-রফা মানে না। নবাবের সঙ্গে তাদের কয়েকবার আপোস হয়েছে, চাঁদ রায়, কেদার রায়, ইশা খাঁর সঙ্গেও হয়েছিল, কিন্তু তারা কোন কথাই রাখেনি, সুযোগ বুঝে চাটগাঁ দখল করে বসে আছে। আমরা যখনই তাদের কাছে

ছুটে যাবো তখনই তারা বুঝবে আমরা দুর্বল, তখনই তারা এখানকার দখল নিয়ে আমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে, দাস করে বিক্রী করবে আরাকানে। সেভাবে বাঁচার চেয়ে মুখোমুখি হাতাহাতি লড়াই করে মরাও ভাল। কবিরাজ কি বল?

বলরাম এতক্ষণ চুপ করেছিল, এবার বললো—তোমাদের দু'জনের কথাই ঠিক। আমরা কয়েকজন পালিয়ে বাঁচিতে পারি, কিন্তু এতোগুলি লস্করকে বাঁচাতে হলে কি করবো একটু ভেবে নিই।

ইয়াকুব বললো—তুমি ভাবতে ভাবতে ওরা যে এসে পড়বে।

বলরাম বলল—ভাবনা আমার শেষ হয়ে গেছে, এখন তোমরা আমার পরামর্শ মতো যদি চলো তবে তো?

—বল, কি তোমার পরামর্শ? —দু'জনেই জিজ্ঞাসা করলো।

বলরাম বললো—আমাদের তিনজনকে তিন পথে যেতে হবে। ইয়াকুব সাহেব যাবে মগ জাহাজে। মহম্মদ সাহেব এখনি রওনা হবেন হাতিয়া। আর আমি ছিপ নিয়ে বেরিয়ে যাবো ক্যাপটেন গনজালিশের সন্ধানে গাঙের ভিতরে। আমরা একটা মস্ত সুযোগ সৃষ্টি করবো যাতে এক ঢিলে দুই পাখি মরবে—মগও যাবে হার্মাদও যাবে, চাই কি চাটগাঁও আমরা দখল নিতে পারি।

॥ কুড়ি ॥



বিশখানা যুদ্ধজাহাজের বহর নিয়ে মেংরাজগী নিজেই বেরিয়েছিলেন সন্দীপের উদ্দেশে। রাতের অন্ধকারেই আরাকানী বহর সন্দীপ পৌঁছে যেতো, কিন্তু সন্ধ্যার পরেই খানিকক্ষণ ঝড়-জল হওয়ায় তারা এক প্রহর দেরী করতে বাধ্য হয়।

সন্দীপের কাছে এসেই মেংরাজগী নির্দেশ দিলেন—কামান দাগো, ওদের জানিয়ে দাও যে আমরা এসেছি।

আগের নিশানাদার জাহাজ থেকে একসঙ্গে চারিটি গোলা এসে পড়লো সন্দীপে।

ইয়াকুব, মহম্মদ ও বলরাম, ইতিপূর্বেই বন্দী খালাসীদের সব সরিয়ে দিয়েছিল। বড় জলাটার পিছনে যে জঙ্গল ও ঘন বাঁশঝাড় ছিল সবাইকে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার পিছনে।

এবার একখানি ছিপ নিয়ে, ইয়াকুব জলে ভেসে পড়লো, মাথার উপর একখানা সাদা কাপড় উড়িয়ে দিল নিশান করে।

চারটে গোলা পড়ার ফল কি হয় দেখার জন্য মেংরাজগী জাহাজের ছাদে দাঁড়িয়েছিল। চরায় কোন সাড়া নেই দেখে সে অবাক হলো। তারপর তার নজরে এলো ইয়াকুবের ছিপখানা।

ছিপ এসে ভিড়লো জাহাজের গায়। উপর থেকে দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হলো ইয়াকুব উঠে এলো জাহাজের ছাদে।

সামনেই জমকালো পোশাক, জরীদার টুপি দেখেই ইয়াকুব বুঝলো যে ইনিই একজন মাতব্বর। নত হয়ে কুর্নিশ করে বললো—হুজুর, আমি আপনার কাছে দরবার করতে এসেছি—

মেংরাজগী বললেন—তুমি কে?

—এখানকার বন্দী খালাসীদের আরজী নিয়ে এসেছি হুজুর।

—তোমাদের কাপ্তান সাহেব পাঠিয়েছেন?

—না হুজুর, আপনাদের গোলা পড়তেই কাপ্তান সাহেব পালাতে যাচ্ছিল, আমরা তাকে আটক করেছি। বাকি সাহেবরা সব পালিয়েছে। আমরা এখানে প্রায় দু'শো জন বন্দী খালাসী আছি, আপনারা কামান দাগলে আমরা মারা পড়বো। কামান দাগার কোন দরকার নেই, হুজুর। এখানে লড়াই করার মতো মানুষ কেউ নেই।

মেংরাজগী বললেন—সাহেবরা কোন্ মতলব করে তোমাকে পাঠিয়েছে, তাতো ঠিক বুঝতে পারছি না।

—সাহেবরা পাঠায় নি হুজুর।

—তোমাকে দেখে তো গেঁয়ো খালাসী বলে মনে হয় না।

—আমি নবাবী ফৌজে দারোগা ছিলাম হুজুর, সাহাবাজপুরের লড়াইয়ে ওরা আমাকে ধরে এনেছে। আমি এখানে ছ'মাস ধরে মাটি কাটছি, জাঙ্গাল বানাচ্ছি।

—কাল তোমরাই তো আমার ভাইয়ের জাহাজ জ্বালিয়েছ, ভাইকে খুন করেছ।

—আমরা কি করবো হুজুর, আমরা তো খালাসী মাটি-কাটা লস্কর। এখন সুবিধা পেয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

মেংরাজগী চুপ করে কয়েক মিনিট ভাবলেন, তারপর ইয়াকুবকে বললেন—তুমি বলছ লড়াই করতে হবে না? বেশ, আমরা চরায় নামবো। যদি এর মধ্যে তোমাদের কোন দুষ্ট মতলব দেখি, তাহলে তোমার মাথাটাই আগে নেবো। তুমি থাকবে আমার সঙ্গে।

—কোন মতলব নেই হুজুর, ডিসুজা কাপ্তানকে আমরা বেঁধে রেখেছি, তাকেও তুলে দেবো আপনার হাতে।

মেংরাজগী তখনই জাহাজ থেকে সৈন্যদের নামার নির্দেশ দিলেন।

হৈচৈ করতে করতে পরপর দশখানা ডিঙ্গি গিয়ে ভিড়লো ঘাটে। তার মধ্যে মেংরাজগীও ছিল ইয়াকুবের সঙ্গে।

ইয়াকুব মেংরাজগীকে নিয়ে গেল ডিসুজার তাঁবুতে।

ডিসুজাকে ইয়াকুব তাঁবুর এক খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে গিয়েছিল। এখন ইয়াকুবকে দেখেই ডিসুজা গালিগালাজ সুরু করলো।

এবার ডিসুজার হুঁস হলো, ভাল করে মেংরাজগীর পানে তাকিয়ে বললো—তুমি তো আরাকানী সেনাপতি, তোমাকে তো আমি দেখেছি···চট্টগ্রামে···হ্যাঁ, চট্গাঁওয়ে—

—আমি চট্টগ্রামের ফৌজদার, তুমি ক্যাপটেন গনজালিশের সঙ্গে গিয়েছিলে, আমাদের সঙ্গে চুক্তি করতে।

—ঠিক ঠিক, তুমি তো বন্ধুলোক।

—তাই ভাইয়ের জাহাজে কাল আগুন লাগিয়েছ।

—তোমাদের জাহাজে আগুন ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাল একখানা জাহাজ ঘাটে জ্বলছিল বটে, দেখেছি।

—সেই জাহাজে আমার ভাই ছিল, বে-হদিশ হয়ে গেছে।

—বড়ই দুঃখের কথা।

—সে তো তুমিই করিয়েছ সাহেব।

—আমি ? আমি তো বাঁধা পড়ে আছি এখানে—

—তোমাদেরকে আমি চিনি সাহেব। সাত সুমুদ্দুর পেরিয়ে এসে তোমরা শুধু মিথ্যা, ধাপ্পা আর জুয়াচুরির উপর চালাচ্ছ, বেকায়দায় পড়লেই তোমরা ভালমানুষ সাজো, আর সুযোগ পেলেই নিজের মূর্তি ধরো। আমি তোমাদের চিনি।

তাঁবু থেকে মেংরাজগী বেরিয়ে এলেন। অনুচরদের হুকুম দিলেন —নদীর ধারে উঁচু বাঁশ খাটাও—

বাঁশ খাটানো হলো।

দুপুর বেলা সেই বাঁশের আগায় ডিসুজাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।



॥ একুশ ॥

বিশজন দাঁড়ীর দাঁড়ের ক্ষিপ্র ওঠাপড়ায় ডাকাতিয়া ছুটে চলেছে পশ্চিম মুখো। শেষ রাত্রির অন্ধকারে কালো নদীর জলে সলুইটি কালোয় কালো মিশে গেছে। হালের দু'পাশে মুখোমুখি বসে আছে বলরাম ও মহম্মদ। হালের হাতল ধরা আছে মহম্মদের হাতে।

দু'জনের মুখে কোন কথা নেই। দু'জনেই নিজের ভাবনায় মগ্ন।

ধীরে ধীরে পূবে অরুণাভাস দেখা দিল। বলরাম সূর্যপ্রণাম করলো। তারপর ধীরে ধীরে বললো—তোমাদের লড়াইয়ের হিড়িকে পড়ে আমার আহ্নিক-পূজা, রোগীর সেবা—সবই গেল।

মহম্মদ হেসে বললে—আমারও কি নেমাজ পড়া হচ্ছে? খোদাতালাকে ডাকতে হলে মনে শান্তি দরকার কিন্তু এখন তো আমাদের মন বড় চঞ্চল।

বলরাম বললো—আমরা ওদের সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠছি না—সেটা আমাদের দুর্বলতা।

মহম্মদ বললো—নবাব এদিকটায় বিশেষ নজর দেন নি, সেই-জন্যই ওরা এতটা বেড়ে উঠতে পেরেছে। সাহাবাজপুরের লড়াইয়ে ফৌজদারের দুই জামাই খতম্ হয়েছে, এবার ফৌজদারের টনক নড়েছে, তিনি ঢাকায় এসে বসেছেন এবং হাতিয়ায় একটি ঘাঁটি করতে চাইছেন। হাতিয়ায় যে বহর আছে, তাই নিয়ে এবার আমরা মেঘনার মুখে রুখবো।

—ওতে কুলবে না, আমরা আবার মার খাবো। আমাদের অন্য মতলবে চলতে হবে। হার্মাদদের ফিরিয়ে আনতে হবে। মগদের সঙ্গে ওদের লড়াই হবে। একদল মার খেয়ে হটে যাবে। যারা জিতবে তারাও তখন অবসন্ন, তখন তাদের উপর আমরা চড়াও হবো। দুই শত্রুই একসঙ্গে কাত্ হবে।

—হার্মাদরা ফিরবে কেন? তারা তো লুঠ করতে বেরিয়েছে, এখন পুরোদমে নদীর দুপাশের বসতি লুঠ করে তবে তো ফিরবে।

—সে ভার আমার। তুমি হাতিয়া পৌঁছেই আমাকে একখানা ছিপ আর একজন দাঁড়ী দিয়ে দিও। যত তাড়াতাড়ি পারি ক্যাপটেন গনজালিশের দরবারে আমাকে পৌঁছাতে হবে। তুমি এর মধ্যে হাতিয়ায় বহর তৈরী রাখবে।



॥ বাইশ ॥

হাতিয়ায় একবেলা বিশ্রাম করেই বলরাম একখানি ছোট ছিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। ছিপে পাঁচটি মাত্র মানুষ, চারজন দাঁড় ধরলো আর একজন হাল ধরলো। বলরাম আরো বড় ছিপের আশা করেছিল, কিন্তু মহম্মদ বললো—আর কেউ যেতে রাজী নয়। বলছে শেষে হার্মাদরা ধরে খালাসী করে কোথায় বেচে দেবে, ওদেরকে বিশ্বাস নেই, জেনেশুনে এই ঝুঁকি নিই কেন? তারা বন্দুক বল্লম নিয়ে মুখোমুখি লড়াই করতে রাজী, কিন্তু হাতিয়া ছেড়ে হার্মাদদের মাঝে যেতে রাজী নয়। বখশিষের লোভ দেখিয়ে এই পাঁচটি লোককে জোগাড় করেছি।

বলরাম বললো—পৌঁছাতে দেরী হবে।

মহম্মদ বললো—ছোট ছিপ, দেরী হবে না।

কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই, বলরাম বেরিয়ে পড়লো।

ছিপ ছুটলো পশ্চিমে।

জল—জল—আর জল। মেঘনার এই মোহনা সাগরের মতো। দিক্‌সীমা অবধি জল আর আকাশ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। জলের টান যত না আছে তার চেয়ে বেশী আছে ঝড়ো হাওয়া। শক্ত হাতে হাল না ধরলে নৌকার দিক ঠিক রেখে এগিয়ে যাওয়া সহজ নয়।

সূর্য অস্ত গেল। ছিপ সাহাবাজপুর পার হয়ে মেঘনার চরের দিকে চললো। পূবের আকাশে চাঁদ দেখা দিল। বলরাম হালের সামনে বসে ঝিমুচ্ছে। মাঝে মাঝে সামনের পানে তাকাচ্ছে। চারিপাশে শান্ত সমাহিত স্তব্ধতা, দাঁড়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

গাঙের ভিতরে ঢুকে দাঁড়ীদের দাঁড়টানা কিছুটা ঢিলে পড়লো বলে মনে হলো। বলরাম একসময় মাঝিকে বললো—ঢিলে পড়লো বলে মনে হয়?

মাঝি বললো—এখন জোয়ার এসে গেছে, এখন আর বেশী জোর দেবার দরকার নেই। এরাও একটু হাঁপ ছাড়ুক।

বলরাম বললো—আমার যে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো দরকার গো। আমি যত দেরীতে পৌঁছাবো ওদিকে ততো বেশী লুঠ হবে—ততো বেশী মানুষের দুঃখ বাড়বে।

মাঝি বললো—তুমি ধার্মিক বামুন-মানুষ দাদাঠাকুর, তুমি তাই সদাই ভাবো মানুষের কষ্টের কথা। মানুষের দুঃখকষ্ট কেউ কি কমাতে পারে, এ অদেষ্টের লেখা, কপালে যা আছে ভুগতেই হবে দাদাঠাকুর, কেউ খণ্ডন করতে পারবে না।

বলরাম বললো—তবু চেষ্টা করতে হবে, হাত পা ছেড়ে বসে থাকলে তো চলবে না। অসুখ করলে ওষুধ খেতে হবে, তাতে রোগ কিছু কমবে তো!

—তা তুমি বলতে পার দাদাঠাকুর, তুমি পণ্ডিত মানুষ শাস্তর পড়েছ। আমরা কিন্তু বাবু অদেষ্টই মানি। নাহলে দেখ না কেন আমরা গয়াধামের মানুষ, ঘুরতে ঘুরতে আজ এসে পড়েছি হাতিয়ার চরায়।

—তোমরা সবাই কি গয়াধামের লোক?

—হ্যাঁ, ডাকাতিয়ার বিশজন মাঝিই এক গাঁয়ের এক দলের মানুষ।

—দল নয়, বল জাত—এক জাতের মানুষ।

—না বাবু, আমরা সবাই এক জাত নই, সবাই এক দলের। আমরা সবাই 'বনজারা', ভগলপুরে জমিদারের খাজনা লুঠতে গিয়ে ধরা পড়ি। তখনই আমাদের কতোল হবার কথা। দারোগা করিম সাহেবের কাছে কেঁদে পড়ি, তিনি আমাদের বরকন্দাজ করে দেন, সেই থেকেই আমরা নাওয়ারা ফৌজে খালাসী রয়ে গেছি। সবই বরাত!

বলরাম বললো,—তোমরা তাহলে খুনজখম লুঠতরাজে সবাই পাকা লোক!

—আমরা কি আর কিছু করেছি দাদাঠাকুর, যিনি মালিক তিনি যা করিয়েছেন তাই করেছি, তিনি যা পাইয়ে দিয়েছেন তাই নিয়েছি। আমরা তো নাচের পুতুল দাদাঠাকুর, তিনি সুতো ধরে নাচাচ্ছেন, আমরা নাচছি। তিনি কাউকে বাদশা বানাচ্ছেন, আবার কাউকে ফকির করছেন। সবের মালিক তিনিই।

বলরাম মাঝির মুখের পানে তাকালো। কোন কথা বললো না। এই ধরনের মানুষ সে আরও দেখেছে, এই ধরনের কথা সে আরো শুনেছে।

সহসা মাঝি বললো—দেখ তো দাদাঠাকুর, দূরে কোন আলো নজরে পড়ছে—

বলরাম ঠাহর করতে চাইল।

মাঝি বললো—ওই জাহাজী আলো দেখা যাচ্ছে দাদাঠাকুর, কাছাকাছি গিয়ে আপনাকে আমরা চরায় নামিয়ে দিয়ে চলে আসবো। বেশী কাছে আমরা যাবো না। হার্মাদদের আমরা বিশ্বাস করি না দাদাঠাকুর। সুবিধা পেলেই আমাদের ধরে খালাসী করে নেবে। জান কালি হয়ে যাবে, ছিপখানাও যাবে—জীবন বরবাদ হবে।

বলরাম আর একটু এগিয়ে বিনাবাক্যে ছিপ থেকে নেমে পড়লো। এক হাঁটু কাদা-জল, হাতে একটা লাঠি ছিল, তারই ঠেকা দিয়ে সে তীরে এসে উঠলো।

—আমরা বিদেয় হলাম দাদাঠাকুর, পেন্নাম হই।—-

বৈঠার ধাক্কায় ছিপ চরা থেকে সরে গেল।



॥ তেইশ ॥

একটা বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে বলরাম একবার চারিপাশ ঠাহর করে নিলে। সবই তো ঝোপঝাড় আগাছা, পথ কোথায় ?

শেষ অবধি জলের কিনারা দিয়ে পায়পায় সে এগোতে লাগলো। মাথার উপর চাঁদ আছে তাই ভরসা, নইলে এসব জায়গায় অনেক সময় কুমীর শুয়ে থাকে।

প্রায় আধক্রোশ যাবার পর নজরে এলো এক পথ নদীতে এসে নেমেছে। এবার বলরাম সেই পথ ধরে পা চালালো।

কিছুটা গিয়েই সে এক গাঁয়ে এসে পড়লো। পরিত্যক্ত গ্রাম। ঘরগুলোর চালা নেই, দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে, কেমন যেন ভূতুড়ে-ভূতুড়ে মনে হয়।

বলরাম ফিরলো। প্রথম যে বাড়ীটা পেল, তার চাতালে গামছাখানা বিছিয়ে শুয়ে পড়লো, যা করার কাল সকালে করবে।

রাত তখন দুপ্রহর পার হয়ে গেছে।

তা যত রাতই হোক, প্রত্যূষের ব্রাহ্মমুহূর্তে বলরামের ঘুম ভেঙে গেল।

নদীতে স্নান-আহ্নিক সেরে বলরাম আবার ফিরে এলো। পেয়ারা গাছ থেকে কয়েকটা পাকা পেয়ারা পেরে নিলে। তারপর সেই পেয়ারা চিবুতে চিবুতে শুরু হলো পথ চলা। দিনের আলোয় নদীর ধার দিয়ে পথ চলা সহজ হলো।

এখন জাহাজগুলো অনেক কাছে। পরপর অনেক জাহাজ। সবার মাথায় কালো নিশান।

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে, লাঠির ডগায় গামছাখানা বেঁধে বলরাম মাথার উপর তুলে ধরলো, তারপর হাঁক ছাড়লো—হো—হো—হো—

খানিকবাদে জাহাজ থেকে একখানা ডিঙ্গি নিয়ে চারজন বন্দুক-ধারী হার্মাদ এদিকে এলো।

বলরাম বললো—ক্যাপ্‌টেন গনজালিশকে চাই—আমি বলরাম কবিরাজ—পণ্ডিত রোজা—

একজন হার্মাদ বোধ হয় বলরামকে চিনতো, বললো—তুমি তো সন্দীপে ছিলে ?

—হ্যাঁ, খবর আছে, চল--ক্যাপটেন্ গনজালিশকে সব বলবো—

সাহেবরা বলরামকে ডিঙ্গিতে তুলে নিলে।

পাঁচখানা জাহাজ পেরিয়ে নদীর মাঝে একখানি ছোট জাহাজে ক্যাপটেন গনজালিশের আস্তানা। ক্যাপটেন চলা-ফেরার সুবিধার জন্য ছোট জাহাজই পছন্দ করতো।

জাহাজ ছোট হলেও ছাদের চারপাশে পর পর আটটা কামান সাজানো।

ক্যাপটেন গনজালিশ ও ডেপুটি রডারিখ একই জাহাজে ছিল। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে বলরাম ছাদে এসে উঠলো। হাতজোড় করে নমস্কার করে বললো—হুজুর, জরুরী খবর আছে।

ক্যাপটেন বললো—তুমি সন্দীপ থেকে এখানে এলে কি করে ?

—সে অনেক কথা হুজুর। শুধু আপনাকে একটা খবর দিতে এলাম। আরাকানীরা সন্দীপ দখল করেছে। ডিসুজা সাহেবকে তারা ফাঁসী দিয়ে বাঁশের আগায় ঝুলিয়ে দিয়েছে। বিশ-ত্রিশখানা আরাকানী জাহাজ ঘাঁটি করেছে সন্দীপে, আপনি এদিক ছেড়ে এখন সেই দিকে যান—

—তুমি সত্যি কথা বলছ ?

—আমি বামুন পণ্ডিতের ছেলে, মিছে কথা বলি না।

—আমরা তো হার্মাদ ডাকাত, তোমাদের লুঠ করতে এসেছি, আমরা তোমাদের শত্রু। আমার ভাই খুন হয়েছে, আমাদের উপর হামলা হয়েছে, সেই খবর আমাকে জানাবার জন্য তুমি এতো ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছ কেন ? নিশ্চয়ই একটা কোন মতলব আছে।

—তাতে আর কি লাভ হবে? দুদিনেই তুমি সন্দীপ থেকে তো আবার ফিরে আসবে। তিন দিনের মধ্যে আমরা এখানে এমন কিছু করতে পারবো না, যে তোমাদের ঠেকিয়ে দিতে পারবো। কাজেই মিথ্যা বলে লাভ কি?

—কিন্তু চাটগাঁইয়ার ফৌজদার মেংরাজ তো আমার বন্ধুলোক। তাকে তো আমি মেঘনার পূর্বপার ছেড়ে দিয়েছি। সে এমন করবে কেন?

রডারিখ্ এবার বললো—এই কালো আদ্মিগুলোকে তুমি বিশ্বাস করো না, এদের জবানের কোন দাম নেই। বিশ্বাস করলেই ঠকবে।

গনজালিস সে কথার কোন জবাব দিলে না। বলরামের মুখের পানে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো, তারপর বললো—বেশ, আমি এখনি সব বহর নিয়ে ফিরে যাচ্ছি, তবে তোমাকেও যেতে হবে—

বলরাম বললো—আমি আর তোমার সঙ্গে যাবো না সাহেব। আমি বামুন, পূজা-অর্চনা করি, রোগীর সেবা করি, এসব মারামারি কাটাকাটি আমার ভাল লাগে না। আমি ঘরে ফিরে যাবো।

—আমি তোমাকে কাছে রাখতে চাই, তোমার মতো মানুষ আমি আর দেখিনি। তুমি সাপের রোজা, তুমি বুদ্ধিমান, তুমি সোজা কথা বল, তুমি কাজের লোক। তোমাকে আমি সন্দীপের খাসমুন্সী করে আমার কাছে রাখবো।

গনজালিশের কথা শুনে বলরামের মনে হলো, এ যেন একেবারে ভিন্ন মানুষ, দুর্দান্ত হার্মাদ ক্যাপটেন নয়।

বলরাম বললো—আমি বামুন পণ্ডিত পূজারীর ছেলে, আমি তো তোমাদের কাছে চাকরী করবো না, সাহেব।

—টাকা পাবে, জায়গীর দোব।

বলরাম হাসলো, বললো—আমাদের শাস্ত্রে কি বলে জানো সাহেব? এ জীবনে কিছুই থাকে না। টাকা-পয়সা হীরে-জহরৎ যা কিছু তুমি জমাও-না সাহেব, সে সব থাকবে কিন্তু তুমি থাকবে না।

কেন এতো হুজ্জত? দুবেলা দু মুঠো অন্ন আর রাতে মাথা গুঁজে থাকার মতো এক ঝোপড়ি হলেই তো দিন কেটে যায়। তাহলে কেন এতো অশান্তি ভোগ করা?

গনজালিশ বললো—যাই বল তোমাকে আমি ছাড়বো না।

চকিতে বলরাম পাশের তিনজন হার্মাদকে পাশ কাটিয়ে ছাদের সীমানায় কাঠের ঘের-এর উপর হাতের ভর দিয়ে টপ্‌কে গেল, পরক্ষণেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

রডারিখ হাঁক দিল—আমার বন্দুকটা দাও!

গনজালিশ বললো—না। যেতে দাও। ও ঠিক সাধারণ মানুষ নয়। ওর বিশ্বাস নিয়ে ও বাঁচুক। যেতে দাও—

তারপরেই গনজালিশের হুকুমে বিউগিল বাজলো—নোঙর তোলো—ফিরে চলো—

জাহাজে জাহাজে পাল উঠলো। গনজালিশের জাহাজ এগিয়ে গেল সবার আগে।

বলরাম তখন এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে গামছায় গা মুছছে।



দ্বিতীয় পর্ব

॥ এক ॥



নদীর চর দিয়ে বলরাম চলেছে। চলেছে উত্তরমুখো।

নদীর ধারে বন। ঘন বন। ছোট-বড় নানা গাছ। গাছের গোড়ায় আগাছার জঙ্গল। এই জঙ্গলের পাশ দিয়ে চলার বিপদ আছে। সাপ, কুমীর ও বাঘের ভয়। সাপ গাছের উপর থেকে গায়ে লাফিয়ে পড়ে। কুমীর কোথায় যেন ঘাপটি মেরে থাকে হঠাৎ তরতর করে নেমে আসে ঘাড়ের উপর, একেবারে টেনে নিয়ে যায় জলে। তবে দিনের বেলা বাঘ থেকে সে ভয় নেই। কাছাকাছি বাঘ থাকলে ফেউ ডাকবে। নইলে গাছের উপর বাঁদরের লাফালাফি চলবে। বলরাম তাই সামনে, পাশে, মাথার উপর সজাগ নজর রেখে জলের কিনারা ধরে চলেছে। মাঝে মাঝে নরম মাটিতে হাঁটু অবধি বসে যাচ্ছে, চলতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু উপায় কী?

একখানা নৌকো দেখতে পেলেও না হয় হাঁক দিয়ে ডাকতো, কিন্তু যতদূর চোখ যায়, জল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। হার্মাদের ভয়ে নাও নিয়ে সব পালিয়ে গেছে।

এইভাবে বেশীদূর যাওয়া চলে না। ক্রমে দুই হাঁটু যেন অসাড় হয়ে আসে। তবু চলতে হয়।

বেলা বাড়ছে। ক্রোশখানেক পথ যেতেই এক প্রহর কেটে গেল। কিন্তু এই বনের তো শেষ দেখা যাচ্ছে না। কত চলবে?

সহসা বড় একটা ঝোপ পার হয়ে একটা পথ দেখতে পেল বলরাম। দিব্যি ঘাটের পথ, ঘাট থেকে পথ ঢুকেছে বনের ভিতর দিকে। বেশ চওড়া পথ, দু-তিনজন মানুষ পাশাপাশি যেতে পারে। বলরাম সেই পথ ধরলো।

কিছুটা গিয়েই বন পাতলা হয়ে গেল। আগাছার জঙ্গল শেষ হয়ে বাগান দেখা দিল। তারপর গাছের আড়ালে দেখা দিল বসতি।

বলরাম গ্রামে পেঁছালো।

পর পর কয়েকখানি মেটে ঘর। সামনের সীমানায় বেড়া দেওয়া। কিন্তু বেড়ার আগল বন্ধ, বন্ধ ঘরের দরজাও। কোথাও মানুষ-জন নেই। সব চুপচাপ।

হার্মাদরা লুঠে নিয়ে গেলে বেড়ার আগল, ঘরের দরজা এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতো না। মানুষগুলো তাহলে ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে।

সামনের এক বাড়ীর উঠানে সারি সারি কলাগাছ। কয়েকটা গাছে কলার কাঁদি ধরেছে। বলরাম ঢুকে পড়লো। দেখতে দেখতে পাকা কলার একটা কাঁদি নজরে পড়লো তার। কাঁদিটাই ভেঙে নেওয়া যায়। কিন্তু এত কলা সে কী করবে? একটা ছুরি কি কাটারি থাকলে কিছু কেটে নিত। তা নেই।

ঘরের দাওয়ায় গিয়ে উঠলো বলরাম। দরজায় কুলুপ নেই। শিকলে খড়ের দড়ি গিয়ে গিঁট বাঁধা। বলরাম দড়ি খুলে ঘরে ঢুকলো। ঘরখানা বড় ঘর। একপাশে কয়েকটা হাঁড়ি-কলসী। আর একপাশে কাঁথা, মাদুর আর দুটো বাঁশের আলনা। তাতে কাপড়চোপড় কিছুই নেই।

বলরাম পিছনের ঘরে ঢুকলো। সেটা রান্নাঘর। উনুনের পাশেই একখানা বঁটি পেয়ে গেল সে। বঁটিখানা হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে এলো। কলার কাঁদির খানিকটা কেটে নিলে। তারপর বঁটিখানা ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়ে দরজায় দড়ি বেঁধে আবার পথে নামলো।

ক্ষিদে পেয়েছে খুবই। বলরাম এক-একটা কলা ছাড়ায়, খায়, আর পথ চলে।

বসতির শেষে একটা বড় নিমগাছ। ওরই নীচে সে এবার একটু বসবে। দুপুরের রোদ এবার খর হয়ে উঠেছে।

গাছতলায় আসতেই নজরে পড়লো একটা লোক ওপাশে হেলান দিয়ে বসে আছে।

ঘুরে সামনে যেতেই দেখা গেল, এক বুড়ো একগাদা কাঠকুটো জড়ো করে চকমকি ঠুকছে।

বলরামকে দেখেই বুড়ো চমকে উঠলো।

বলরাম বললো,—কী গো কত্তা, এই গাঁয়ে তো আর মানুষ-জন দেখছি না। লোকজন সব গেল কোথায়?

বলরামের বুকে উপবীত আর কাঁধে কলার কাঁদি দেখে বুড়ো যেন কিছুটা আশ্বস্ত হলো, বললো, তুমি কে কত্তা? কোথা থেকে আসছ?

—আমি আসছি অনেক দূর থেকে। এখানে মানুষজন দেখছি না কেন?

—মানুষ এখানে থাকবে কোন্ ভরসায়? দেখনি হার্মাদী জাহাজ এসেছে নদীতে?

—সে তো জানি। কিন্তু গেল কোথায় সবাই?

—জঙ্গলে পালিয়েছে। এখানে থেকে কি জান-মান খোয়াবে?

—তুমি যাও নি?

—আমার কোমরে বাত, তাই পড়ে আছি। ওদের মতো হাঁটতে পারবোনি তো।

—হার্মাদরা তোমায় পেলে কি ছেড়ে দেবে?

—অদেষ্টে মৃত্যু থাকলে মরবো।

—থাক্, মরতে তোমায় হবে না। হার্মাদরা চলে গেছে।

—আমিও নজর রেখেছিলাম। খানিক আগে হার্মাদী জাহাজ সব বিদেয় হয়েছে। তাই তো আগুন জ্বেলে নিশানা দিচ্ছি। জঙ্গলের ভিতর থেকে ধোঁয়া দেখতে পেলে ওরা ফিরে আসবে।

—তোমার আগুন জ্বালাতে অনেক সময় লাগবে। আমাকে চকমকি দাও, আমি জ্বেলে দিচ্ছি! তুমি আমাকে কিছু খেতে দাও দিকি। আমি সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি, এই কটা কলা ছাড়া আর পেটে কিছু পড়ে নি। বেজায় খিদে পেয়েছে।

—শুনলে তো আমার চলতে-ফিরতে কষ্ট হয়, আর আমি তোমার খাবার নিয়ে আসবো?

—আমি কবিরাজী জানি। তোমার বাত আমি সারিয়ে দেবো।

—সে তো পরে। এখন কোন রকমে বাড়ী গিয়ে পৌঁছানোই আমার দুঃসাধ্যি। আমি আবার আসবো কী করে?

—বেশ, আমি না হয় তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

—ঘরে কি আর কিছু আছে? সবই তো ওরা নিয়ে গেছে।

—মুড়ি, চিঁড়ে, গুড়, কিচ্ছু নেই?

—তুমি অতিথি, চল, দেখি গে, যদি কিছু পড়ে থাকে।

বুড়ো লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

বলরাম বললো,—দাঁড়াও, আগে আগুনটা ভালো করে জ্বালি, ধোঁয়া উঠুক।

বুড়ো আবার ঝুপ করে বসে পড়লো।

বলরাম আগুন ধরালো। ধোঁয়া উঠলো আকাশে। তারপর বলরাম আরো কয়েকটা কলা শেষ করলো। আগুনটা রীতিমতো জ্বলছে তখন।

এবার বুড়োর হাত ধরে বলরাম বুড়োকে দাঁড় করালো। বললো,—চল।

লাঠিতে ভর দিয়ে বলরামের হাত ধরে বুড়ো ঠুক ঠুক করে এগিয়ে চললো।

একে একে অনেকগুলি বাড়ী পার হয়ে বুড়ো এলো নিজের বাড়ীতে। যে বাড়ীর কলাগাছ থেকে বলরাম কলা কেটে নিয়েছিল, সেইটাই বুড়োর বাড়ী। বুড়ো কলাগাছটার পানে তাকিয়ে বললো, এই কাঁদি থেকেই তুমি কলা কেটেছ?

বলরাম বললো,—হ্যাঁ।

—বেশ করেছ। গাছটার ভাগ্যি যে, বামুনের ভোগে এলো। এখন দাওয়ায় উঠে এসে দরজাটা খোলো। আমি তো সোজা হতে পারবো নি।

বলরাম দরজা খুললো। বুড়ো ভিতর থেকে একখানি মাদুর নিয়ে এলো। বললো,—দাওয়ায় পেতে বোসো, আমি দেখি ঘরে কিছু আছে কি না।

দাওয়ায় বসে বলরাম আবার কলা খেতে শুরু করে দিলে।

খানিক পরে একটি ছোট চুপড়িতে একচুপড়ি মুড়ি আর চারটে শশা নিয়ে বুড়ো এলো। বললো,—এই নাও, খাও। ঘরে এই মুড়িক'টা ছিল, আর ওদিকের মাচায় এই ছোট ছোট শশা।

বলরাম বললো,—এতেই আমার ঢের হবে।

—এ কি আর খাওয়া রে বাবা, এ তো জল-খাওয়া। বাবা, তোমার জল চাই তো? ওদিকে কুয়ো আছে, দড়ি কলসী আছে, জল তুলে নাও গে, বাবা।

বলরাম চলে গেল কুয়াতলায়। হাত-মুখ ধুয়ে কুয়ার ঘটিতেই একঘটি জল নিয়ে এসে বলরাম দাওয়ায় বসলো মুড়ি খেতে। খেতে খেতে বুড়োর সঙ্গে আলাপ করলো।

এটা জেলেদের বসতি, নাম জেলেপাড়া। ছাব্বিশঘর মানুষ আছে এখানে। মাছ ধরাই এদের জীবিকা। রোদে মাছ শুকিয়ে নিয়ে শুটকিমাছ এরা মেহেন্দীগঞ্জের হাটে জোগান দেয়। ব্যাপারীরা সদাগরী জাহাজে জোগান দেয় সেই মাছ। কিন্তু হার্মাদের উৎপাত শুরু হওয়া থেকে দুবছর সেই কারবার বন্ধ হয়েছে। এই পথে বাহির-দরিয়ায় সদাগরী জাহাজ আর যায় না। এখন চাষ-আবাদের উপরেই দিন চলে। নগদ পয়সা-কড়ির খুবই অভাব। দুবছরে একখানা কাপড় কি গামছা কিনতে পারে নি অনেকেই। তবে একটা সুবিধা আছে, এই জঙ্গল পেরিয়ে জমিদারের পেয়াদা এখানে আর খাজনা আদায় করতেও আসে না।

বলরাম বললো,—তোমরা কি তাহলে মাছধরা ছেড়েই দিয়েছ?

বুড়ো বললো—বাপ-ঠাকুর্দার পেশা কি এত সহজে ছাড়া যায় বাবু। কেউ কেউ মাঝে মাঝে ডিঙি নিয়ে বেরোয়, মাছ ধরে আনে নিজেদের খাবার মতো। বেশী ধরলে পাড়া-পড়শীকে বিলি করে।

এবারের বর্ষাকালে আমরা ঝাঁক ঝাঁক ইলিশমাছ পেয়েছিলাম বাবু। গোটা মাস কেউ আর ভাত খায় নি, সকালে একটা মাছ আর বিকেলে একটা মাছ—

—শুধু ভেজেছ আর খেয়েছ ?

—ভাজবো কি বাবু, এত তেল কোথায় পাবো ? সিদ্ধ করেছি, কাঠকয়লার আগুনে সেঁকে নিয়েছি।

—এত যে মাছ ধরো, তা নৌকো কোথায় ? ঘাটে তো একখানা ডিঙিও দেখলাম না !

—ঘাটে ডিঙি দেখবে কেমন করে বাবু, ঘাটে কি আর ডিঙি রাখবার যো আছে ? কখন্ হার্মাদরা এসে পড়বে, ডিঙি দেখলেই টেনে নিয়ে যাবে। বুঝতে পারবে, এখানে বসতি আছে, চড়াও হয়ে সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে। তাই ডিঙি কেউ জলে নামিয়ে রাখে না। নদী থেকে এসেই সবাই ডিঙি তুলে রাখে ঝোপের মধ্যে জঙ্গলের আড়ালে। নদী থেকে কিছুই নজরে আসে না।

—এটা তোমরা খুব বুদ্ধির কাজ করো। কিন্তু ঝোপে-জঙ্গলে ডিঙি রাখা, সাপের ভয় তো আছে ?

—না বাবু এই তল্লাটে মা-মনসার উপদ্রব কম। আমরা মাছের যত তেল-ফুলকো আশেপাশে ছড়িয়ে ফেলি সেইগুলো খেতে আসে বেঁজির দল। এই তল্লাটে বেঁজি আছে অনেক, মা-মনসা তাই চট করে এদিকে ঘেঁষে না।

—বাঘ ?

—না, বড় মিঞার উপদ্রবও এখানে কম। বছরে দু-দশদিন হাঁকডাক শোনা যায় এই পর্যন্ত।

কথায় কথায় বলরামের খাওয়া শেষ হলো। একঘটি জল গলায় ঢেলে সে উঠে পড়লো। বললো—এবার আমি উঠি কত্তা, আমায় অনেক দূর যেতে হবে। আশীর্বাদ করে যাই, তোমাদের কল্যাণ হোক।

—এখনি চলে যাবে ঠাকুর ? আমাকে যে বাতের ওষুধ দেবে বলছিলে !

—ওঃ, বিলকুল ভুলে গেছি। কোমরে বাত? কত দিন হয়েছে?

—তা পাঁচ-সাত বছর হবে। কোমরে, হাঁটুতে।

—বয়স কত?

—দু-কুড়ি তো হবেই, তিন-কুড়িও হতে পারে।

—এই বয়সে ও রোগ একেবারে যাবে না। তবে কষ্ট অনেক কমে যাবে। শোনো, আকন্দপাতা ছেঁচে গরম করে নিয়ে প্রলেপ লাগাবে। তার উপর আকন্দপাতা দিয়ে বেঁধে রাখবে। কিছুদিন করলেই ফল পাবে। আর রসুন-তেল মালিশ করলেও ফল হয়। তা তেল কেনার পয়সা তো তোমাদের এখন নেই, সকালে কাঁচা রসুন খেও।

—আকন্দপাতাই ভালো বাবু, জঙ্গলে অনেক পাবো। আপনি একটু পায়ের ধূলো দিয়ে যান বাবু। বামুন, তার উপর অতিথি নারায়ণ। অনেক পুণ্যের ফলে আজ আপনার পায়ের ধূলো এখানে পড়েছে!

বুড়ো এগিয়ে এসে বলরামের পায়ের ধূলো নিলে। বলরাম বুড়োর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলো। তারপর পথে নামলো।

আবার ঘাটের পথ ধরলো সে। নদীর কাছাকাছি এসে তার গতি মন্থর হয়ে গেল। দুপাশের জঙ্গলের দিকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকাতে লাগলো সে। দু-চারপা যায় আর তাকায়।

শেষে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে যা চাইছিল সে, তা মিলে গেল—একটা ছোট ডিঙি।

ডিঙিটা ওলটানো। কাছে গিয়ে সোজা করতেই নীচে দুটো বৈঠা পাওয়া গেল।

বলরামের দেহে শক্তি আছে, তবু একার পক্ষে ডিঙিটা ঘাট অবধি টেনে নিয়ে যাওয়া সহজ হলো না। রীতিমত কষ্ট করে ডিঙি নিয়ে এলো জলের কিনারায়। তখন তার কপাল থেকে ঘাম ঝরছে।

খানিক জিরিয়ে নিয়ে বলরাম ডিঙি জলে ভাসালো। বৈঠা দুটো হাতে নিয়ে স্বস্তি পেল, মনে জোর পেল। নদীতে জোয়ারের টান ছিল। খুব সহজেই বলরাম ভেসে চললো উত্তরমুখো।



॥ দুই ॥

অতি সহজেই উজানে বৈঠা বাইছে বলরাম। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ভাঁটার টান ধরলো। তখন ঠেলে এগিয়ে যাওয়া আগের চেয়ে শ্রমসাপেক্ষ হয়ে পড়লো। বলরাম ক্লান্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু পাড়ে যে কোথাও ডিঙি ভিড়িয়ে খানিক জিরিয়ে নেবে তারও উপায় নেই। নদীর ধারে সবই তো জলা-জংলা। কাজেই বৈঠা বেয়েই চললো সে।

আরো ঘণ্টাখানেক পরে বলরামের নজরে এলো বেশ খানিকটা ফাঁকা জমি আর নারকেল গাছের সারি। এদিকটায় তাহলে বোধ হয় চাষ-আবাদ হয়, জনবসতি আছে। বলরাম এবার তীর ঘেঁষে ডিঙি নিয়ে এলো নজর রাখলো তটের দিকে।

এক সময় গাছতলায় দুটো ছেলে নজরে এলো। বলরাম ডিঙি ঘাটে ভেড়ালো। চড়ার উপর ডিঙিটা খানিক তুলে নিয়ে বলরাম এগোলো ছেলে দুটোর কাছে।

একগাদা কাঠকুটো লতাপাতায় আগুন দিয়ে বসে আছে ছেলে-দুটি। বলরাম বললো,—কী করছিস রে?

মুখ না তুলেই ছেলেরা জবাব দিল—মাছ পুড়াচ্ছি গো, খাবো নি?

—বাড়ী নিয়ে গিয়ে খা না।

—বাড়ী-ঘর কি আর আছে নাকি? তিন দিন আগে ফিরিঙ্গি ডাকাতেরা সব তো পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। কত জনকে মেরে ফেললো, কত জনকে ধরে নিয়ে গেল! তুমি জানো নি?

—আমি অনেক দূর থেকে আসছি, কী করে জানবো বল্? তা তোদের তো ধরে নি?

—আমরা ছুভাই একটা নিমগাছে উঠে বসেছিলাম, ওদের নজরে পড়ে নি।

—তোদের বাপ-মা ?

—বাপ-মা তো নেই, কবেই মরে গেছে। দাদা-বৌদিকে ওরা ধরে নিয়ে গেল। যাবার সময় আমাদের ঘর-বাড়ী সব পুড়িয়ে দিয়ে গেল।

ছেলে ছুটি আরো অনেক কথাই বললো—হার্মাদী অনাচার অত্যাচারের গতানুগতিক কাহিনী।

তারা ছুই সহোদর ভাই, নাম কালু ও মালু। রাত্রে গাঁয়ে হার্মাদরা হামলা করেছিল। তাদের হৈ-চৈ ও হুল্লোড়ের মধ্যে এক ফাঁকে অন্ধকারে কালু মালু বাড়ীর পিছনে একটা বড় নিমগাছের উপর উঠে বসেছিল। হার্মাদরা তাদের ধরতে পারে নি। না হলে তাদের বয়সী অনেক ছেলেকেও তারা ধরে বেঁধে নিয়ে গেছে। কয়েকজন বুড়ো-বুড়ীকে তারা তো মেরেই ফেললো। তারপর যাবার সময় গাঁয়ের সব চালায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

ওরা চলে যাবার পর কালু-মালু গাছ থেকে নেমেছে। চারিপাশে অত মৃতদেহ দেখে ভয়ে তারা তখনই সেই গাঁ ছেড়েছে। সেখানে তারা ছুজন ছাড়া আর কেউ তো ছিল না তখন। তারা ছুভাই এবার নগরে চলে যাবে। নদীর ধার দিয়ে তারা চলেছে। তারা জানে এই নদীর ধারেই নারায়ণগঞ্জ, মুনসিগঞ্জ, ঢাকা। এই পথেই তারা নগরে গিয়ে পৌঁছাবে। ছুদিন গাছ থেকে ডাব পেড়ে খেয়েছে। আজ জোয়ারের টানে অনেক চিংড়িমাছ ধরেছে, সেইগুলোই কলাপাতা জড়িয়ে পোড়াচ্ছে।

বলরাম বললো,—তোরা আগুন জ্বাললি কী করে ?

মালু বললে,—আসার সময় কালু বললে, 'একেবারে খালি হাতে পথে বেরুনো ঠিক নয় রে, এই ঘরে কিছু পাই কিনা দেখি।' ভুতোদের বাড়ীর একখানা ঘরে তখনও আগুন ধরে নি। কালু সেই ঘর থেকে একখানা কাস্তে, গামছা আর চকমকি নিয়ে এলো। তিনটেই খুব কাজে লেগেছে গো। কালুর খুব বুদ্ধি।

বলরাম তাদের পাশে বসে পড়লো। বললো, আমাকে কিছু খাওয়া না, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে!

—ডাব খাবে?

—আছে?

—এক কাঁদি। আমরা দুজনে আর কটা খেয়েছি।

কালু একটা গাছের পাশ থেকে একটা কাঁদি টেনে আনলো। বললো,—গোটা দশেক কাটি তাহলে, তোমরাও খাবে, আমিও খাব।

কালু কাস্তে নিয়ে ডাব কাটতে সুরু করলো। দেখতে দেখতে দশটা ডাব কাটা হয়ে গেল। সে বললো,—আগে জলটা খাও, তারপর আছাড় মেরে ডাব ভেঙে শাঁস খেও।

ছয়টা ডাবের জল বলরাম একাই খেল। তারপর সেই ছয়টা ভেঙে যে শাঁস মিললো, কাস্তে দিয়ে তা-ই ছাড়িয়ে নিয়ে বসে বসে চিবুলো। এদিকে মালুরও মাছ পোড়ানো তখন শেষ হয়েছে। কলাপাতায় জড়ানো একগাদা বাগদা চিংড়ি পুড়ে টকটকে লাল হয়ে গেছে। কালু বললো,—একটু নূন থাকলে খাওয়াটা জমতো, তা আর হলো না।

চিংড়িগুলো তিনভাগ করে একটা ভাগ তারা বলরামকে দিল। সে প্রায় এককুড়ি হবে। মাছ খেয়ে বলরাম বললো,—এতক্ষণে পেট ভরলো, গায়ে জোর পেলাম। যাক, তোরা এখন আমার সঙ্গে যেতে চাস তো বল্? আমার ডিঙি আছে।

—তোমার ডিঙি আছে? —কালু-মালুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—তাহলে তো আর হাঁটতে হবে না! চলো।

কালু-মালু বলরামের অনুগামী হলো।

বলরাম কথা বলার সঙ্গী পেল, বৈঠা বাইবারও ভাবনা রইল না।

ডিঙি জলে নামিয়ে কালু মালু দুজনে দুই বৈঠা ধরলো, ডিঙি ছুটলো তরতর করে।

সোনার গাঁয়ে পৌঁছাতেই সন্ধ্যা উতরে গেল।



॥ তিন ॥

ঘাটের মুখেই কোতোয়ালী কোষা নোঙর করা। কোষার মুখে লাল লণ্ঠন জ্বলছে, মাস্তুলের মাথায় ঝুলছে আরেকটা লাল লণ্ঠন। চাঁদের আলোয় কোষার তুপাশে তুটো কামানের চোঙ নজরে আসছে। কোষা ঘাটে পাহারা দিচ্ছে।

ঘাটে অনেক নৌকো। টিমটিম করে লণ্ঠন জ্বলছে। মানুষের চলাফেরা নজরে আসছে। কয়েকটা দোকানীর লণ্ঠনও চোখে পড়ছে।

ঘাটের গায়ে সারি সারি খুঁটি পোঁতা। কালু একটা খুঁটি ধরে ডিঙির মুখের একটা আংটার সঙ্গে গামছা বেঁধে সেই খুঁটিতে বাঁধলো। বললো,—যাক, এতক্ষণে ভরসা পেলাম, মানুষের মুখ দেখা গেল।

মালু বললো,—কোতোয়ালী নাও রয়েছে, কামান রয়েছে, এখানে আর ফিরিঙ্গীরা এগোবে না।

বলরাম হাসলো—ফিরিঙ্গী জাহাজেও এমনি কামান অনেক আছে। তুখানা ফিরিঙ্গী জাহাজ তুদিক থেকে কামান দাগলে এরা সামলাতে পারবে না।

কালু বললো,—ডাকাতরা ফৌজদারের সঙ্গে লড়বে ?

বলরাম বললো,—এরা গেঁয়ো ডাকাত নাকি যে, কামানের ভয়ে পালাবে ? এরা তুর্দান্ত দস্যু, এরা দরকার হলে লড়াই করে। এই কিছুদিন আগে সাহাবাজপুরে লড়াই করে নবাবী ফৌজকে শেষ করে দিয়েছে।

—নবাবী ফৌজ শেষ ? —কালু কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

—আমি সেখান থেকেই আসছি। সে লড়াই দেখেছি।

—তুমি সেখান থেকে আসছ ? —কালু-মালু বড় বড় চোখ করে বলরামের পানে তাকালো। বলরাম বললো,—ও কথা এখন থাক্, এখন কি খাওয়া যায় বল দিকি ? কিছু খাবার কিনে আনবো যে, পয়সা তো নেই।

কালু বললো,—নারকেল তো এখনও অনেক রয়েছে, ও-ই খাবো। তারপর কাল সকালে মাছ ধরবো।

মালু বললো,—গামছা দিয়ে ডিঙ্গি বেঁধেছ, মাছ ধরবে কী করে ?

—সে কাল দেখা যাবে। এখন তো ডাব খাই।—বলে কালু ডাব কাটতে বসে গেল।

তিনজনে শাঁসে-জলে গোটা ষোল ডাব শেষ করে ডিঙির পাটার উপর গা এলিয়ে দিল। মাথার উপর চাঁদ ও একআকাশ তারা, নদীর মিঠে হাওয়া আর নৌকোর দুলুনি ধীরে ধীরে একসময় তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিল।

সেই ঘুম ভাঙলো শেষরাতে জোয়ারের জলের ধাক্কায়। ডিঙ্গি রীতিমতো দুলে উঠলো, বাঁশের খুঁটিতে ধাক্কা দিল ঠকঠক করে। বলরামের ঘুম ভেঙে গেল। রাত তখন শেষ, চাঁদ পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। চারিপাশ শান্ত স্তব্ধ, রাত্রিশেষের নীরব অনুভূতি।

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে বলরাম ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো :

প্রণমামি অহম্ বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং
নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্
ত্বমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্
পতিম্ পতীনাম্ পরমং পরস্তাৎ॥

তারপর ডিঙির পাশে বসে চোখেমুখে জল দিয়ে ডাকলো—কালু, মালু, ওঠ, ভোর হয়েছে। জোয়ার এসেছে।

তখনই তারা ডিঙি ছেড়ে দিল উজান দরিয়ায়। ঘাটের কোতোয়ালী কোষাকে পাশ কাটিয়ে তারা চললো মুনশীগঞ্জের উদ্দেশে। উজান দরিয়ায় ডিঙি ভেসে চললো তরতর করে।

তবু মুনশিগঞ্জে পৌঁছোতে একটা বেলা কেটে গেল।

বড় গঞ্জ। ঘাটে অনেক নাও। ঘাটের মুখে নবাবী কোষা। কোষার মাথায় লাল নিশান, কোষার দুপাশে কামানের চোঙ।

কোষাকে পাশ কাটিয়ে ঘাটে যাচ্ছে, এমন সময় কোষার উপর থেকে ডাক এলো—ও বভিঠাকুর!—বভিঠাকুর!

অনেকদিন পরে পুরানো ডাক শুনে চোখ ফেরালো বলরাম, কোষার উপর থেকে এক দাড়িওলা মুসলমান তাকে ডাকছে। একটু ঠাহর করেই বলরাম চিনলো, তাদের পাশের গ্রাম মুনশীপাড়ার রহিম সেখ। বললো,—কে? রহিমচাচা?

ডিঙি ভিড়লো কোষার পাশে। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে বলরাম উঠে এলো কোষার ছাদে।

রহিম বললো,—শুনেছিলাম, তোমাকে হার্মাদরা ধরে নিয়ে গেছে। তুমি আবার এখানে এলে কি করে?

বলরাম হেসে বললো,—ঠিকই শুনেছ চাচা। এখানে এসেছি এখন বরাতজোরে। এখন যাচ্ছি ঢাকায় ফৌজদারের কাছে।

রহিম বললো—আমারও নসিব যে, তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে গেল। তুমি আমাকে নারায়ণগঞ্জে নিয়ে চল। চারদিন আগে আমার মহাজনী নাও হার্মাদরা ডুবিয়ে দিয়েছে। আগেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম বলে বেঁচে গেছি। এই কোষায় আছি চারদিন, ফিরতে পারছি না। হাতে পয়সা নেই, নাও ভাড়া দেব কোথা থেকে? তাই চেনা মানুষের আশায় বসে আছি। তোমাকে পেয়ে গেলাম—এ আল্লার মেহেরবানী।

বলরাম বললো,—চাচা, আমাদেরও হাতে পয়সা নেই, দুদিন পেটে অন্ন নেই, দুটো ছেলে বৈঠা ঠেলছে, শুধু কয়েকটা নারকেল খেয়ে।

—সেজন্য ভাবনা নেই, কোষার দারোগাকে বললেই খাবার ব্যবস্থা হবে। তুমি এসো—



॥ চার ॥

ধলেশ্বরী এসে যেখানে মেঘনায় মিশেছে, সেই মুখে এক গঞ্জ। এই গঞ্জের পত্তন বেশী দিন হয় নি, কিন্তু অল্পদিনেই বেশ জমে উঠেছে। লোকে নাম দিয়েছে নারায়ণগঞ্জ।

আগে এই পথে মুনশীগঞ্জ রাজনগর হয়ে সদাগরী ডিঙা যেতো সাহাবাজপুরে। ওপারে ঈশা খাঁর শক্ত ঘাঁটি ছিল ত্রিবেণী কেল্লা। তখন এ অঞ্চল খুব জমজমাট। তারপর হিজলীর যুদ্ধে ঈশা খাঁ নিহত হলেন, প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করে নিয়ে গেল মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহ। ত্রিবেণী ম্লান হয়ে গেল, শুরু হলো হার্মাদদের উৎপাত। ত্রিবেণীর মানুষ এসে উঠলো নারায়ণগঞ্জে। কাছেই ঢাকা—ফৌজদারদের ঘাঁটি, কাজেই নিরাপত্তা বেশী। এখানে ঘাটের দুপাশে উঁচু-উঁচু বুরুজে বড় বড় চারটে কামান পাতা আছে, অনেক দূর অবধি সেই কামানের বহর। হার্মাদরা যতই দুঃসাহসী আর দুরন্ত হোক, সহজে এই কামানের বহরের মধ্যে আসে না। তাছাড়া রাতে বন্দুকধারী বরকন্দাজ মশাল নিয়ে পাহারা দেয় ঘাটের পাশে।

গঞ্জের পিছনে পোয়াটাক পথ দূরে পাঁচিলঘেরা ফটকওলা মস্ত বাড়ী। সেকালের এক রাজবাড়ী। কোন্ ভুঁইয়া রাজা এখানে এই বাড়ী করেছিলেন তা কেউ মনে রাখে নি। সে বংশের কেউ আর এখানে নেই। এখানে এখন আস্তানা করেছেন ফৌজদার ইব্রাহিম খাঁ।

শান্তিপ্রিয় ধার্মিক মানুষ ইব্রাহিম খাঁ। যুদ্ধের ঝামেলা তিনি এড়িয়ে চলতেই ভালবাসেন। প্রথম জীবনে কয়েকটা ছোটখাটো

লড়াইয়ে তিনি সাহস দেখিয়েছিলেন, তারপর অনেক কাল আর কোন লড়াই করতে হয় নি। কিন্তু সম্প্রতি ওই পর্তুগীজ বোম্বেটেরা বেজায় উৎপাত শুরু করেছে, তাদের এই বেপরোয়া লুঠ-পাট আর সওয়া যায় না। তাদের সঙ্গে একটা চরম বোঝাপড়া করার জন্যেই তিনি ঢাকায় এসে বসেছেন।

এর মধ্যে সাহাবাজপুরে হার্মাদদের সঙ্গে একটা লড়াই হয়ে গেছে। চারখানা নবাবী বড় কোষা সেখানে ছিল, তার সব কখানিই হার্মাদরা ডুবিয়েছে। দুখানা বজরা গেছে। সলুই চারখানা কিন্তু বেঁচে গেছে, আর ছিপ রক্ষে পেয়েছে সব ক'খানাই। সেই লড়াই থেকে হটে আসা বরকন্দাজ ও মাঝি-মাল্লাদের কাছ থেকে লড়াইয়ের সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন ইব্রাহিম খাঁ, তারপর লড়াইয়ের নতুন কৌশল ঠিক করেছেন। সেইভাবেই তৈরী হচ্ছেন তিনি। সব সালতি আর পানসী জড়ো করেছেন, ছোট ছোট কামান বসিয়েছেন, চটপট ঘোরাফেরা ও চলাফেরার সুবিধার নানা কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন, হার্মাদী কামান যাতে নিশানা ঠিক রাখতে না পারে। বড় বড় কোষা নিয়ে জবরজঙ লড়াই চলবে না।

সোনার গাঁ, মামুদপুর, বিক্রমপুর থেকে কামান আনিয়ে ইব্রাহিম খাঁ ঢাকার তোষাখানায় বসিয়ে দিয়েছেন। কামারশালার বিস্তার হয়েছে। সপ্তাহে পঞ্চাশটি করে ছোট কামান তৈরী হচ্ছে। জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকা) নামকরা কর্মকার হরবল্লভ ও জনার্দনকে তিনি বসিয়ে দিয়েছেন পরিদর্শনের কাজে, দরকার হলে তারা নিজের হাতেও কাজ করতে পিছপা হয় না। অন্য দিকে চলছে গোলা তৈরীর কাজ।

ইতিমধ্যে মুকসুদাবাদ থেকে এক হাজার ভালো বন্দুক আর তার উপযোগী গুলিবারুদ এসে পৌঁছেছে।

নতুন পঞ্চাশখানা সলুই জলে ভাসানো হয়েছে, তার উপর কামানগুলো বসিয়ে দিতে যা দেরি।

একশোখানা দেশী ছিপও তৈরী।

দারোগা এক-একজন এক-এক দলে একশো করে নেওয়ারা খালাসীকে লড়াইয়ের তালিম দিচ্ছে।

ইব্রাহিম খাঁ এবার এমনভাবে তৈরী হচ্ছেন, যেন পর্তুগীজ হার্মাদদের এই অঞ্চল থেকে একেবারে উচ্ছেদ করে দেওয়া যায়। সেজন্য সময় অবশ্য লাগছে। তা বড় ব্যাপারে সময় একটু লাগবেই।

ইতিমধ্যে খবর এসেছে হার্মাদরা রাজারহাটের কাছে এসে গেছে, ওদিকে লুঠতরাজ শুরু করে দিয়েছে। এবার আর তারা একখানা-দুখানা জাহাজ নিয়ে রাতের অন্ধকারে আসেনি, এসেছে রীতিমতো বহর নিয়ে। সাহাবাজপুরের লড়াই জিতে গন্‌জালিসের সাহস বেড়ে গেছে।

এখুনি পর্তুগীজদের ঠেকানো দরকার, আর সময় নেই। ইব্রাহিম খাঁ ইসলামাবাদ থেকে নারায়ণগঞ্জ অবধি নিজে সব কিছু তদারক করছেন। ওপারে ত্রিবেণী কেল্লাটাও তিনি আবার কামান দিয়ে সাজিয়েছেন, এদিকের কোন ঘাট হার্মাদরা পার হতে না পারে।



॥ পাঁচ ॥

বলরাম নারায়ণগঞ্জে এসে পৌছালো।

রহিম চলে গেল ইসলামাবাদে, সেখানে তার মহাজনের আড়ত আছে, বলরাম এলো ফৌজদারের কাছারীর ফটকে। ফটকের পাহারাদার বললো,—ফৌজদার সাহেব ত্রিবেণী গেছেন, ফিরতে সন্ধ্যা হবে। তার আগেও অবশ্য ফিরতে পারেন।

সন্ধ্যা হতে তখনও প্রায় দু প্রহর বাকি। বলরাম আর কোথায় যাবে, পথের ওপাশে একটা বড় অশথ গাছ আছে তারই ছায়ায় বসে রইল।

ফৌজদার ফিরলেন সন্ধ্যার আগেই। পথে হাতী আসতে দেখেই বলরাম উঠে দাঁড়ালো। হাতী কাছে আসতেই দুহাত কপালে ঠেকিয়ে বলে উঠলো,—পেন্নাম হই হুজুর,— সেলাম !—

হাতীর পিঠে ফৌজদার ছিলেন, সঙ্গে ছিল একজন মুনশী আর একজন দেহরক্ষী। হাতের ইশারায় থামালেন তিনি। বলরামকে এক নজরে দেখে নিয়ে বললেন,—কে তুমি ? কী চাও ?

—আমি সন্দীপ থেকে আসছি হুজুর, খবর আছে।

—সন্দীপ থেকে আসছ !—ফৌজদার বিস্মিত।

—হ্যাঁ, হুজুর, হার্মাদরা আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করেছিল। একমাস তাদের কাছে মাটি-কাটা মজুরের কাজ করেছি, তারপর পালিয়ে এসেছি হুজুর। ওখানকার অনেক খবর আছে হুজুর। গন্‌জালিসের খবর।

—খাস দারোগার সঙ্গে কথা বলেছ ? বাইরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

— আমি আপনার দরবারে এসেছিলাম হুজুর। ফটকের সিপাহী বললো, আপনি এই পথে ফিরবেন ! তাই পথের উপরেই দাঁড়িয়ে আছি।

—দেশে ফেরার জন্যে তোমার রাহাখরচের দরকার। দারোগাকে বললে সে-ই ব্যবস্থা করে দেবে।

—আমি একটা পয়সাও চাই না হুজুর, আমি লড়াই চাই, আমি চাই হার্মাদরা খতম হোক, আপনি তাদের খতম করুন।

ইব্রাহিম খাঁ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বলরামকে ভালো করে দেখে নিলেন। পৈতা গলায় সাধারণ এক ব্রাহ্মণ যুবক, কিছুটা বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান বলে মনে হয়। আর কোন বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে না ! তবু সন্দীপ থেকে যখন আসছে, সেখানকার খবরটা কিছু শুনলে ক্ষতি নেই। বললেন,—বেশ, তুমি সেরেস্তাখানায় গিয়ে বসো, আমি পরে এত্তেলা দেবো।

ফৌজদারের নির্দেশে হাতী ফের চলতে শুরু করলো, দেউড়ির ভিতরে চলে গেল।

বলরাম অনুসরণ করলো।



॥ ছয় ॥

মস্ত সেরেস্তাখানা।

কয়েকজন মুনশী জলচৌকির উপর খাতা-পত্তর নিয়ে বসে কাজ করছে। একপাশে বলরামকে বসিয়ে রেখে খাস মুনশী সেই যে ভিতরে চলে গেল, দু ঘণ্টার মধ্যে তার আর দেখা নেই।

ফরাসের উপর দেয়ালে হেলান দিয়ে বলরাম বসেই আছে। কত লোক আসছে, মুনশীদের কাছে দু-এক কথা বলে যাচ্ছে। বলরামের উপর কারো নজর নেই।

একসময় একজন চোঙদার এসে খবরদারী করলো—সন্দীপের ঠাকুরমশাই স্নান আহ্নিক করবেন না?

বলরাম বললো,—দরকার নেই, আমি এখানেই জপ সেরে নিয়েছি।

—ফৌজদার সাহেব শুনলে আমাকে বকাবকি করবেন।

—তাঁর তো শোনার কিছু নেই, আমার তো কোন অসুবিধা হয় নি।

—কসুর মাফ করবেন, কোন দরকার হলেই ডাকবেন। —বলে চোঙদার বিদায় হলো। বলরাম আবার আত্মস্থ হলো।

রাত এক প্রহর অতিক্রান্ত হলো। দেউড়িতে ঘণ্টা পড়লো।

এমন সময় সেরেস্তায় এসে ঢুকলো রহিম সাহেব, সঙ্গে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান, মাথায় জরির টুপি। বলরামকে দেখে রহিম বললো,—কি গো বত্তিঠাকুর এখনও আছ? দেখা হয় নি?

বলরাম তো অবাক, বললো,—তুমি আবার ফিরে এলে ?

—আমার সাহেব গঞ্জে এসেছিলেন দেখা হয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে এলাম। তা তোমার খবর কী ?

—দেখা হয়েছে। ফৌজদার সাহেব বসতে বলেছেন।

—বসার দরকার নেই। তুমি আমার সঙ্গে এসো।

রহিম বলরামকে সঙ্গে নিয়ে ফৌজদারের খাসকামরায় ঢুকে পড়লো।

ফৌজদার তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গড়গড়ায় তামাকু সেবন করছেন। আশেপাশে কয়েকজন পার্শ্বচর। এরা কুর্নিশ জানাতেই তিনি বললেন,—সেলাম আলেকম, তসরীফ রাখিয়ে।

তারপর বলরামকে বললেন,—তুমি এখনও বসে আছ ? কাজের মধ্যে আমার খেয়ালই ছিল না। পর্তুগীজরা চারিপাশে বহুৎ হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছে ! যাক্, তোমার কথাই আগে শুনি। বল, তোমার কী খবর আছে ?

বলরাম বন্দী হওয়া থেকে শুরু করে গন্‌জালিসের জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া অবধি সব কথাই সংক্ষেপে বললো।

গোড়ায় ইব্রাহিম খাঁ অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন, শুনতে শুনতে তাঁর কৌতূহল জমে উঠলো। শেষ দিকে মাঝে মাঝে দু-একটা প্রশ্নও করলেন। তারপর বললেন,—তোমাকে দেখে তো সাদাসিধে বামুন পণ্ডিত বলে মনে হয়, কিন্তু তুমি তো দুঃসাহসী, খুব বুদ্ধিমান ! নবাবী ফৌজে থাকলে তুমি একদিন মন্‌সবদার হয়ে যাবে।

রহিম চুপ করে সব শুনছিল, এবার বললো,—হুজুর, ওঁর আরেক মস্ত গুণ আছে। উনি সাপের বদ্যি। সাপে কাটলে, যে সাপই হোক, ঠিক আরাম করবেন। আমাকে কেউটে সাপে কেটেছিল, উনি আমাকে বাঁচিয়ে তোলেন।

—তাহলে তো গুণী লোক !—ফৌজদার বললেন, তুমি এখন অতিথিশালায় আহার ও বিশ্রাম কর গে, কাল সকালে দরবারে এসো।

বলরাম বললো,—আপনি কাল আমার দেশে যাবার ব্যবস্থা করে দিন হুজুর। অনেক দিন আমি ঘরছাড়া। মা ভাবছেন।

ফৌজদার বললেন,—সে তো যাবেই, তবে কয়েকদিন পরে। তুমি এখন কয়েকদিন আমার কাছে থাকো, পর্তুগীজ কাপ্তানের লড়াইটা দেখে যাবে। আমার সঙ্গে তুমি সন্দীপ যাবে, তারপর আমার সঙ্গেই ফিরবে। এত কষ্ট সয়ে শুধু হাতে ফিরবে কেন? যাবার সময় তোমাকে আমি ইনাম দেবো। এখন মুসাফিরখানায় গিয়ে বিশ্রাম কর গে। কাল সকালে এসো।

একজন চোগুদার এসে বলরামকে সেলাম দিল। বলরামকে উঠে পড়তে হলো।



॥ সাত ॥

ইব্রাহিম খাঁর প্রস্তুতি-পর্ব প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল, দুদিন পরেই নৌবহর নিয়ে তিনি রওনা হলেন।

দশখানা ছোট কোষা, কুড়িখানা সলুই আর একশো ছিপ। কোষায় দুটি করে কামান, সলুইয়ে একটি করে কামান আর ছিপে বন্দুকধারী বরকন্দাজ। দামামা পিটিয়ে, তোপধ্বনি করে ফৌজদারের নাওয়ারা বাহিনী ছুটলো মোহানার দিকে দক্ষিণমুখো।

সবার আগে ফৌজদারের কোষা। সেই কোষাতে বলরামও আছে।

ভাঁটার টান থাকায় সন্ধ্যার মুখেই তারা এসে পৌঁছোলো সাহাবাজপুরে। ফৌজদার বললেন,—এখানে আর নোঙর করার দরকার নেই। আকাশে চাঁদ আছে, একেবারে হাতিয়া চল।

নৌবহর অগ্রগামী হলো।

রাত দ্বিতীয় প্রহরে নৌবহর পৌঁছালো হাতিয়া।

চৌকিদারী কোতোয়ালী ছিপ আগেই নজর করেছে, সারি সারি আলোর মালা এগিয়ে আসছে, দারোগাকে খবর দিয়েছে। দারোগা ইসমাইল খাঁ জানে, ফৌজদারি বহর আসবে, সে সদলবলে ঘাটে এসে অপেক্ষা করছে। ফৌজদারের নিশানদারী কোষা ঘাটে এসে নোঙর করতেই ডিঙি নিয়ে ইসমাইল ছুটে এলো, সেলাম জানালো উপরওয়ালাকে। ইব্রাহিম বললেন,—এদিককার খবর কি?

দারোগা বললো,—কাপ্তান গন্‌জালিসের পুরো নৌবহর এখানে দেখা গেছে কদিন আগে। সন্দীপে আরাকানী হামলা হয়েছিল। ওদিকে দুপক্ষের একটা বড় রকমের লড়াই হয়ে গেছে সারাদিন ধরে। আরাকানীরা বোধ হয় হটে গেছে। পর্তুগীজরা ওদের পিছনে ধাওয়া করেছে। সন্দীপের এদিকে আর কোন বহর নেই। আমাদের ছিপ গেছে খবর নিতে, ভোরে ফিরবে।

ইব্রাহিম খাঁ জিজ্ঞাসা করলেন,—গন্‌জালিসের বহর মেঘনায় উজান বেয়ে সোনার গাঁ অবধি গিয়েছিল, তোমরা তখন কি তাদের উপর নজর রেখেছিলে?

দারোগা বললো,—হ্যাঁ হুজুর আমাদের তিন্‌খানা ছিপ গিয়েছিল তাদের পিছনে।

—ওদের বহর কত?

—কুড়িখানা জাহাজ।

—ওরা তাহলে এবার লুঠ করতে যায় নি, লড়াই করতে গিয়েছিল। বড় রকমের দাঁও মারাই ওদের এবার লক্ষ্য ছিল। সন্দীপে ওদের আর কত বহর আছে জানো?

—সন্দীপে যা রেখে গিয়েছিল হুজুর, সেসব মগেরা খতম করে দিয়েছে। সেজন্যেই কাপ্তান ফিরে এসে সন্দীপে লড়াই করতে গিয়েছিল, সেখানে সারাদিন লড়াই হয়েছে। মগেরা হটে গেছে, তাদের পিছনে বোম্বেটেরা ধাওয়া করেছে। আমাদের নায়েক মহম্মদ খাঁ আছে চর-ইসমাইলে। সেখান থেকেই আজ খবর এসেছে।

বলরাম কাছেই ছিল। বললো,—হুজুর মহম্মদকে ডেকে পাঠান। তার নিজের মুখে সব শুনুন।

ইব্রাহিম বললেন,—এখুনি লোক পাঠিয়ে দাও, মহম্মদ এসে আমার সঙ্গে দেখা করুক।

দারোগা সেলাম দিয়ে বিদায় নিল।

ইব্রাহিম খাঁ বলরামকে বললেন,—তোমার খবর শুনেই কাপ্তান ফিরেছে। সময় পেলে সে নারায়ণগঞ্জ অবধি ধাওয়া করতো।

বলরাম বললো,—আপনিও তো তৈরী ছিলেন হুজুর।

—লড়াই হলেই তো ক্ষতি। আমরা জিততাম, কিন্তু হয় নারায়ণগঞ্জ নয়তো মুনশীগঞ্জ ওদের কামানের গোলায় শেষ হয়ে যেতো। দু-দশটা গোলা পড়লেই তো একটা বসতি শেষ। তোমার জন্যেই এদিকটা রক্ষা পেয়েছে। এখন বারদরিয়ায় লড়াই হবে, ফৌজে ফৌজে লড়বে, কোন ঝামেলা নেই।

বলরাম বললো,—আমি তো নিমিত্তমাত্র হুজুর, সব সেই বিশ্বনাথের ইচ্ছা।

ইব্রাহিম বললেন,—খোদা নিজে কিছু করেন না, মানুষই সব করে। খোদা করিয়ে নেন। আমরা সেই মানুষেরই কাজের তারিফ করি।



॥ আট ॥

ইতিমধ্যে আরাকানী নৌবহর সন্দীপে এসে নেমেছে।

মগ সেনাপতি মেংরাজগী তো মহাখুশী। এত সহজে সন্দীপ দখল হয়ে যাবে, সে ভাবতেই পারে নি।

আট-দশজন ফিরিঙ্গী বোম্বেটেকে কোতল করে, ডিসুজাকে ফাঁসিতে লটকে প্রতিশোধ তো নেওয়া হলো, এখন এই সন্দীপে দখল রাখা নিয়ে একটা কিছু করতে হয়।

ইয়াকুব বলেছিল,—হুজুর, এখানে আপনি দখলদারী নিয়ে বসুন, ফিরিঙ্গীরা, যেন এখানে আর আস্তানা করতে না পারে। আমাদের এখানে কামান রয়েছে, গোলা-বারুদ রয়েছে। আপনি কয়েকজন ভালো গোলন্দাজ বসিয়ে দিন, তাহলেই কাজ হবে। আমরা এখানে প্রায় দুশো জোয়ান খালাসী আছি। হাতাহাতি লড়াই করার মতো হাতিয়ার এখানে আছে। ওরা নামতে চেষ্টা করলে আমরা রুখবো।

মেংরাজগী হেসে বললো,—ওরা আগে জাহাজ থেকে কামান দেগে নামার পথ পরিষ্কার করে তারপর নামবে।

ইয়াকুব বললো,—আমরা কি ওদের গোলা খাবার জন্যে এখানে জমায়েত হয়ে থাকবো? সবাই ছড়িয়ে থাকবো ওই জলা-জংলার গাছপাতার আড়ালে। আমার বাবা ছিলেন কিল্লাদার; আমি লড়াইয়ের কায়দা-কানুন কিছু কিছু জানি হুজুর।

মেংরাজগী ইয়াকুবের মুখের পানে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো, ইয়াকুবকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। ইয়াকুব নবাবের লোক। নবাবের সঙ্গে মগেদের বিবাদ চলছে বহুদিন ধরে। নবাবী ফৌজকে হটিয়েই তো মগেরা চট্টগ্রাম দখল করেছে। এদের বিশ্বাস করে এতগুলো কামান এদের কাছে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। বললো,—আসলে তো সবকটা কামানই উত্তর দিকে বসানো আছে। এদিকটা না হয় রোখা গেল, কিন্তু আর তিনদিকে কী হবে? এ তো আর অল্প জায়গা নয়। এই কটা কামানে চতুর্দিক রোখা যাবে না। ওদের সঙ্গে আমাদের জলেই লড়তে হবে।

মেংরাজগী সঙ্গের লোকদের হুকুম দিলেন—কামানগুলো আমাদের জাহাজে তুলে নাও। সঙ্গে গোলাবারুদও তুলবে।

ছোট ছোট কামান। মগেরা জাহাজে তুলতে তৎপর হলো।

তাড়া না দিলে এদেশের মানুষ ঠিকমতো কাজ করে না। লড়াইয়ের ত্বরা নেই, শত্রুর দেখা নেই, তাগিদ দেবারও কোন হেতু নেই। মগেরা ধীরে-সুস্থে কামানগুলি জাহাজে তুললো, ত্রিশটি ছোট কামান ত্রিশখানি জাহাজের ছাদে তারা তুলে দিল। তারপর

সেগুলি একে একে ঠিকমতো বসাতেই তাদের দুটো দিন লেগে গেল।

তৃতীয় দিন সকালেই খবর এল—ফিরিঙ্গী জাহাজ নজরে আসছে।

দুদণ্ডের মধ্যেই মগেরা সন্দীপ ছেড়ে তফাতে সরে গেল, দুভাগ হয়ে পূর্বে ও পশ্চিমে জোট বাঁধলো। মেংরাজগীর মতলব হলো, ফিরিঙ্গী জাহাজকে মাঝে রেখে দুপাশ থেকে চেপে ধরবে।

কিন্তু কাপ্তান গন্‌জালিস সাতসমুদ্দুর-তেরো-নদী পার হয়ে এদেশে এসেছে লুঠতরাজ চালাতে, লড়াই-মারামারিতে সেও কম অভিজ্ঞ নয়। দূর থেকেই সে নজর রেখেছিল। ঘাটে একখানিও জাহাজ নেই, বারদরিয়ায় আরাকানীরা ডাইনে বাঁয়ে জোট বেঁধেছে। একনজরেই গন্‌জালিস আরাকানীদের মতলব বুঝে নিলে। কাছাকাছি এসে সেও তার নৌবহরকে ছড়িয়ে দিল মেঘনার বুকে।

তারপরেই হুকুম দিলে—কামান দাগো।

দিনের আলোয় গোলা ফাটার আগুনের ঝিলিক স্পষ্ট দেখা গেল না, দেখা গেল ধোঁয়া, আর শোনা গেল আওয়াজ, চোখে পড়লো জলে গোলা ফাটার জলোচ্ছাস।

আরাকানীরা সঙ্গে সঙ্গে কামান দাগলো না, তারা পিছিয়ে গেল। বোম্বেটেরা দুঃসাহসী, তারা কামান দাগতে দাগতে এগিয়ে গেল।

প্রথমে সব গোলা জলে পড়লেও দ্বিতীয় বারের গোলা বিফলে গেল না। তিনটি মগ জাহাজের মাস্তুল উড়ে গেল জাহাজে আগুন জ্বললো, একটি জাহাজে গুলিগোলার রসদ ফাটতে শুরু করলো দুমদাম করে। জনাকতক খালাসী জলে-পড়া মানুষগুলোর উপরে এবার গুলি চালালো।

মগ জাহাজগুলি এবার আরো পিছিয়ে গেল।

এবার আরাকানী জাহাজ থেকে কামান দাগা সুরু হলো।

পর্তুগীজ কামানগুলি জোরালো, গোলা বেশীদূর যায়। আরাকানী কামানগুলি ছোট, পর্তুগীজদের নাগাল পায় না। জ্বলন্ত জাহাজ তিনখানিকে পিছনে ফেলে তারা পিছিয়ে যায়।

দেখতে দেখতে লড়াই এগিয়ে যায় সন্দীপের সীমানা ছাড়িয়ে।

ইয়াকুব আর তার সঙ্গীরা তীরে দাঁড়িয়ে দূরের লড়াই দেখতে লাগলো। ধোঁয়া আর আওয়াজ ক্রমে ক্রমে পূর্ব দিকে সরে যেতে লাগলো। এদিকে মগেদের দুখানা জাহাজ জ্বলতে জ্বলতে একসময় চোখের সামনে তলিয়ে গেল। আর একখানা আগুনটা নিভিয়ে ফেলেছিল, এবার সেখানা একপাশে একটু কাত হয়ে স্রোতের টানে বাহির দরিয়ার দিকে দক্ষিণে ভেসে গেল। তার পাল টাঙাবার মাস্তুল ছিল না। দাঁড় বেরিয়ে ছিল, টানবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

অন্যান্য জাহাজ থেকে যারা জলে পড়েছিল, তাদেরও আর দেখা গেল না। হয়ত হাঙরে, কুমীরে টেনে নিয়ে গেছে।

দু-তিন দণ্ডের মধ্যেই দিক সীমা অবধি শান্ত ও স্তব্ধ হয়ে গেল! এতবড় ঘটনা, এতগুলি মৃত্যু মুছে গেল প্রকৃতির পরিবেশ থেকে।

॥ নয় ॥



বেলা দুপুর। সূর্য ঠিক মাথার উপর উঠেছে। এমন সময় একখানি বোম্বেটে জাহাজ সন্দীপের ঘাটে ফিরে এলো। জাহাজের কালো পালে মড়ার মাথার খুলি আর দু'খানা হাড় আঁকা দেখেই ইয়াকুবের দল বুঝলো, সে জাহাজ গনজালিসের।

জাহাজ ঘাটে এসে ভিড়লো।

ডিঙিতে ঘাটে এসে উঠলো গনজালিস ও তার কয়েকজন অনুচর।

নদীর ধারে বাঁশের খুঁটিতে ডি-সুজার দেহ তখনও ঝুলছে। গনজালিস আর তার সঙ্গীরা মাথার টুপি খুলে সেই খুঁটির নীচে এসে দাঁড়ালো।

খানিক তফাতে ইয়াকুব আর তার সঙ্গীরা দাঁড়িয়ে ছিল। সাহেব

একবার সেদিকে তাকালো, কোনো কথা বললো না। অনুচরদের বললো,—লাশ নামাও।

কয়েকজন বোম্বেটে সঙীনের খোঁচা মেরে বাঁশের গোড়ার মাটি আলগা করে ফেললো, তারপর ধীরে ধীরে বাঁশটি হেলিয়ে নিয়ে ডি-সুজার দেহ নামিয়ে নিলে। দড়ির ফাঁস কেটে মৃতদেহ শুইয়ে দিলে মাটিতে। ডিঙি থেকে মড়ার মাথার কঙ্কাল আঁকা একখানি পাল নিয়ে এসে গন্‌জালিস মৃতদেহটি ঢাকা দিয়ে দিলে। তারপর মৃতদেহের দুপাশে হাঁটু গেড়ে বসে সবাই মিলে প্রার্থনা শুরু করলো।

প্রার্থনা-শেষে বুকের উপর আড়াআড়ি করে হাত রেখে মাথা নত করে সবাই চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর ক্যাপ্টেনের নির্দেশে সবাই উঠে পড়লো।

এবার ক্যাপ্টেন খানিক তফাতে জলার ধারে অশ্বত্থগাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালো। সঙ্গীরা সেখানে সঙীন দিয়ে মাটি কাটতে শুরু করেছে।

ইয়াকুব এতক্ষণ তফাতে দাঁড়িয়ে দেখছিল, এবার সে সঙ্গীদের কি বললো। কয়েকজন ছুটে গিয়ে কয়েকটা খন্তা আর কোদাল নিয়ে এলো। ইয়াকুব তাদের নিয়ে এগিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের কাছে, বললো,—আমরা সাহায্য করবো।

ক্যাপ্টেন রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিলে—না। কোন বিধর্মী নিগারকে দরকার নেই। তফাত যাও।

ইয়াকুব গন্‌জালিসকে খুসি করতে গিয়েছিল, পিছিয়ে এলো।

দেখতে দেখতে কবর খোঁড়া হলো।

ক্যাপ্টেন এবার সঙ্গীদের বললো,—কফিন ছাড়া কবর দেওয়া চলে না, বাক্স চাই।

—জাহাজে তো এত বড় বাক্স নেই!—একজন বোম্বেটে জবাব দিল।

গন্‌জালিস কয়েক মিনিট চুপ করে ভাবলো। তারপর কয়েকজন সঙ্গীকে বললো,—আমার সঙ্গে এসো।

জলার মধ্যে। গন্ জালিসের নির্দেশে বোম্বেটেরা সেই শিকল ধরে টানতে স্বরু করলো। রীতিমতো টানতে টানতে জলার মধ্যে থেকে টেনে তুললো একটি কাঠের সিন্দুক।

বড় সিন্দুক।

সিন্দুকটা উপরে তুলে নিয়ে গন্ জালিসের নির্দেশে তার তালা ভাঙা হলো। ডালা খুলে ফেলা হলো। ভিতর থেকে সবাই মিলে মুঠো মুঠো টাকা তুলে ফেলতে লাগলো জলার ধারে গাছতলায়। গাছতলায় টাকার স্তূপ জমলো। বাক্স খালি হয়ে গেল।

বোম্বেটেরা সেই বাক্স নিয়ে গেল নদীতে। ভালো করে বাক্সটি ধুয়ে নিয়ে এলো শবদেহের পাশে। মৃতদেহটি এবার বাক্সে রেখে গন্ জালিস ডালা বন্ধ করলো। তারপর সবাই মিলে সেই বাক্স নামিয়ে দিল কবরের মধ্যে।

গন্ জালিস এবার একা নিজের হাতে মাটি চাপা দিল সেই বাক্সে।

তারপর আবার সবাই বসে প্রার্থনা করলো।

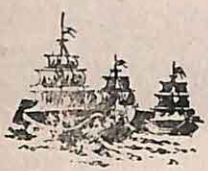
প্রার্থনা-শেষে গন্ জালিস, ইয়াকুব ও তার সঙ্গীদের পানে তাকালো। তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো। তার ভ্রূ কুঞ্চিত ও চোখদুটি ছোট ছোট হলো। তারপর অনুচরদের দিকে ফিরে বললো,—তোমরা দশজন এখানেই থাকো, এদের পাহারা দাও। কোনরকম বেয়াদপি দেখলেই চাবুক চালাবে। যদি সামলাতে না পারো, গুলি করবে। কোন অনুকম্পা করবে না। এদের সর্দার হচ্ছে এইটে (ইয়াকুবকে দেখিয়ে দিল)। আরেকটা আছে, আশেপাশে কোথাও লুকিয়েছে। এই দুটোর উপর কড়া নজর রাখবে। আমরা লড়াই শেষ করে ফিরে আসি। তারপর এদের ব্যবস্থা করবো। সবক'টাকে চালান করবো রোমের বাজারে। ওখানে এই নিগার-গুলোর চাহিদা খুব বেশী। তোমরা ভালো টাকা বখরা পাবে।

একজন বোম্বেটে বললো,—আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না ক্যাপ্টেন, আমরা ঠিক সামাল দেবো।

আরেকজন বললো,—আর ওই টাকাগুলো যে গাছতলায় পড়ে রইল?

গন্‌জালিস তাচ্ছিল্যভরে বললো,—থাক্ না পড়ে, যাবে কোথায়? ফিরে এসেই সব ব্যবস্থা করবো। জাহাজে যদি কোন বারুদের বাক্স খালি পাই, তো এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দশজন সঙ্গীকে রেখে ক্যাপ্টেন একা ডিঙিতে চলে গেল।



॥ দশ ॥

ইয়াকুব সঙ্গীদের নিয়ে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছিল, একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল দশজন বোম্বেটে, হাতে বন্দুক।

গন্‌জালিসের ডিঙি জাহাজের পাশে গিয়ে লাগলো। গন্‌জালিস জাহাজে উঠে গেল পূর্ব দিকে।

এবার বোম্বেটেরা নিজেদের মধ্যে দু-চার কথা বললো। তারা এগিয়ে এলো ইয়াকুবের সামনে। বললো,—তুমি এদের সর্দার?

ইয়াকুব বললো,—না, আমি এদেরই মতো, এদেরই একজন। এদেরই মতো ক্যাপ্টেন আমাকেও ধরে এনেছে।

—ঠিক আছে। আমি যা বলি, শোনো। তুমি তোমার সঙ্গীদের নিয়ে ওই জলার ধারে চলে যাও। যত দিন আমাদের সবাই না ফিরে আসে, তত দিন ওদিকে থাকবে, এদিকে আসবে না। এদিকে এলেই আমরা গুলি চালাবো।

ইয়াকুব বললো,—কিন্তু আমাদের চালডাল সব এদিকে আছে, ওদিকে আমরা খাবো কি?

—চাল-ডাল যা দরকার, এখনি সব নিয়ে চলে যাও। আর তোমাদের এদিকে আসতে আমরা দেবো না। হট্ যাও জল্‌দি!

দশটা উদ্যত বন্দুকের পানে তাকিয়ে ইয়াকুব সঙ্গীদের বললো,

—কেন গুলি খেয়ে মরবে? নিজের খাবার মতো চাল-ডাল নিয়ে চল, আমরা ওদিকে চলে যাই।

এদিকে একটি তাঁবুর মধ্যে কাঠের তক্তা পেতে অনেক বস্তা চাল-ডাল রাখা ছিল। ইয়াকুবের সঙ্গীরা এবার সেইসব বস্তা মাথায় তুলে নিয়ে জলার দিকে অগ্রসর হলো। কুড়ি পঁচিশটা বস্তা নিয়ে যাবার পর বোম্বেটেরা এগিয়ে এলো। বললো,—ওই নিয়েই যাও, আর নয়।

ইয়াকুব বললো,—কিন্তু আমরা যে একশো-দেড়শো লোক!

— ওই ভাগ করে খাবে, আর নেওয়া চলবে না।

—খাবো না?

—না। যাও, কোন কথা নয়। যা পেয়েছে, তাই খাও গে।

—তাদের মুখের পানে তাকিয়ে ইয়াকুব আর কোন কথা বলতে পারলো না। সঙ্গীদের পিছনে সেও এগিয়ে গেল।

জলার ওধারে গাছতলায়, বড় বড় চুল্লী জ্বালার আয়োজন হলো। শুকনো কাঠকুটো এনে ভাত-ডাল ফোটাতে হবে। অবশ্য একাজ তারা রোজই করে, আজও করবে, ভাবনার কিছু নেই। চাল-ডাল আনার সময় মাটির হাঁড়িগুলোও তারা নিয়ে এসেছে।

খানিক পরে চুল্লীর ধারে বসে কথা উঠলো—কাঠের সিন্দুক ভর্তি টাকা—লুঠ করা টাকা। আরো ক'টা সিন্দূক জলে ডোবানো আছে কে জানে!

—সিন্দুকগুলো তুলে টাকাগুলো বের করে নিলে কেমন হয়?

—ভালো হয়। কিছু তারপর? টাকা নিয়ে যাবে কোথায়? একখানাও তো নৌকো নেই। নদী পার হবে কেমন করে? এখানে তো থাকা চলবে না। এ চরা তো বোম্বেটেদের দখলে।

—যদি ভেলা তৈরি করি?

—একটা বড় কুমীর লেজের একটা ঝাপটা মারলেই তো ভেলা ডিগবাজি খাবে। টাকাও যাবে, জানটাও যাবে।

—বোম্বেটেগুলো যে রইল, ওদেরও তো কোন নৌকো নেই। ডিঙিখানা তো ক্যাপ্টেন নিয়ে গেল জাহাজে।

—ওদের এখন ডিঙির দরকার নেই। হাতে বন্দুক আছে, কাজেই প্রাণের ভয় নেই। আর লড়াই শেষ করে দু'দিনেই তো ক্যাপ্টেন ফিরে আসবে।

—তাহলে আমাদের কি এখন কিছুই করার নেই? শেষ অবধি আমাদেরকে কেনা চাকর করেই ওরা বিদেশে চালান দেবে?

একপাশে গাছতলায় বসে চুপ করে সব শুনছিল ইয়াকুব, কোন কথা বলে নি। এবার একজন ইয়াকুবকে জিজ্ঞাসা করলো,—আমাদেরকে সব কেনা চাকর হয়ে চালান যেতে হবে? তুমি কী বল?

ইয়াকুব হেসে বললো,—যদি নসীবে তাই থাকে, তো তাই হবে। তবে বামুন-বস্থি বলরাম তো গেছে হাতিয়ায়। সে যদি কোন ব্যবস্থা করে, তবেই কিছুই হবে। এখন চুপ করে থাকাই ভালো। খোদাতালাকে ডাকো, তিনিই ভরসা।

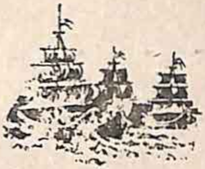
—খোদাতালাকে ঠিকমত ডাকতে পারলে তাঁর মেহেরবানি নিশ্চয়ই হবে—অন্ধকারে পিছন থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

ইয়াকুব ফিরে তাকালো।

একজন মাল্লা এলো সামনে। বললো,—তুমি বামুন-বস্থি বলরামের নাম করলে, তাই তোমার কাছেই এলাম। আমি বলরামের দোস্ত। আমার নাম মহম্মদ খাঁ। আমি হাতিয়া থেকে আসছি তোমাদের খবর নিতে।

ইয়াকুবের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

॥ এগারো ॥



গাছতলায় অন্ধকারে বসে ইয়াকুবের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললো মহম্মদ। ইতিমধ্যে চাল-ডাল সিদ্ধ হয়ে গেছে। খাবার সাড়া পড়ে গেল। ইয়াকুব বললো,—এসো, খেয়ে নাও।

মহম্মদ বললো, আমি ঘাটে ফিরে যাই। আমার ছিপে চিঁড়ে-গুড় আছে। আমি খেয়ে-দেয়ে সঙ্গীদের ডেকে নিয়ে আসি। সময় বেশী নেই, ভোরের বেলা আমাকে আবার হাতিয়ায় ফিরে যেতে হবে।

আকাশে চাঁদ ছিল, মহম্মদ সেই জ্যোৎস্নালোকে ঘাটে ফিরে এলো। ছিপে দু'জন সঙ্গী বসে ছিল। মহম্মদ ছিপে গিয়ে উঠলো। ছিপে বড় গামছায় চিঁড়ে-গুড় বাঁধা ছিল। সেই গামছা-সুদ্ধ চিঁড়ে জলে ডুবিয়ে ভিজিয়ে নেওয়া হলো। তারপর তিনজনে বসে খেতে খেতে কাজের কথা পাড়লো মহম্মদ।

আহার-শেষে ছিপখানি টেনে চড়ায় তুলে রেখে তিনজনে এলো ইয়াকুবের কাছে। ইয়াকুব কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বসেছিল, বললো,—ত্রিশজন জোয়ানকে আমি বেছে নিয়েছি, আরও কি লাগবে ?

মহম্মদ বললো,—ওরা তো দশজন মাত্র। এই যথেষ্ট! চল।

জলার একধারে খানিক তফাতে বোম্বেটেদের তাঁবু। সামনের তাঁবুটার মুখে দু'জন ফিরিঙ্গী কোলের উপর বন্দুক নিয়ে বসেছিল। আর ক'জন শুয়ে পড়েছিল তাঁবুর ভিতর। ঝোপ-ঝাড় আর গাছের আড়াল দিয়ে যতটা কাছে যাওয়া সম্ভব, তারা গেল। তারপর মহম্মদ বললো,—বাঘের ডাক শুনলেই তোমরা সাড়া তুলে সবাই শুয়ে থাকবে, ওরা গুলি চালাবে, তখন দাঁড়িয়ে থাকলেই জান যাবে।

দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে মহম্মদ আরেক দিকে চলে গেল।

কয়েক মিনিট পরেই জলার ধারে ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে বাঘের ডাক শোনা গেল।

কয়েকবার বাঘের ডাক, তারপরেই শেয়ালের—ফেউ ফেউ।

আবার বাঘের ডাক।

ওদিকে যেসব লোকগুলি শুয়ে পড়েছিল, এবার তাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল।

বাঘের ডাকটা যেন কাছে আসছে।

ফিরিঙ্গী দু'জন বন্দুক নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তাঁবুর মধ্যে যারা ছিল, তারাও হাতে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এলো।

আবার বাঘের ডাক।

সঙ্গে সঙ্গে ফিরিঙ্গীরা কয়েকজন ঝোপের দিকে তাগ্ করে গুলি চালালো।

গুলির আওয়াজ থামতে না থামতেই বাঘের ডাক আবার ভেসে উঠলো। ফিরিঙ্গীরা এবার বন্দুকগুলো বাগিয়ে ধরে সেইখানেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো।

ওদিকে তখন ধরে-আনা দলের লোকগুলি খুব হৈ চৈ বাধিয়ে দিয়েছে। ফিরিঙ্গীদের নজর সেইদিকে। ওইদিকে বাঘ এসেছে। আসুক। 'নিগার' দু-একজনকে যদি বাঘে ধরে নিয়ে যায়, তো যাক। দিনের আলো ফুটলে তখন খোঁজ নেওয়া যাবে।

সেই সময় তাদের অলক্ষ্যে একপাশ দিয়ে হামা দিয়ে এগিয়ে এলো ত্রিশজন জোয়ান। তাঁবুর পাশ থেকে একসময় সহসা তারা লাফিয়ে পড়লো দশজন ফিরিঙ্গীর ঘাড়ে। গুঁতোগুঁতি করার কোন অবকাশ ফিরিঙ্গীরা পেলে না। দশজন বোম্বেটেকে কাবু করে গামছা দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলতে ত্রিশ জন জোয়ানের দশ মিনিটও লাগলো না।

এবার ইয়াকুব সাড়া তুললো—আল্লা হো আকবর! কাম ফতে!



॥ বারো ॥

উষালোকে স্নান-আহ্নিক শেষ করে বলরাম কোষার ছাদে পূর্বমুখে দাঁড়িয়ে ছিল। অরুণোদয়ে সূর্য প্রণাম করলো। দিগন্ত-বিস্তারী জলরাশির উপর লাল-নীল আলোর খেলা। ধীরে ধীরে অরুণাভা উজ্জ্বল ও দীপ্ত হয়ে উঠলো। সেই আলোর উচ্ছ্বাসে পূর্ব দিকে একখানি ছিপ দেখা গেল—একটা কালো বিন্দু।

বিন্দুটি ক্রমেই স্পষ্ট হলো।

বেগবান ছিপ তরতর করে কাছে এসে পড়লো।

ক্রমে মানুষগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এবার বলরাম চিনলো ছিপের শেষদিকে হালের মতো একখানা দাঁড় ধরে বসে আছে মহম্মদ খাঁ। মুখে, শাঁখের মতো দু'হাত দিয়ে বলরাম উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল—মি-এা—সা-হে-ব।

বাতাস সেই দিকেই বইছিল, মহম্মদ হাঁক শুনতে পেল। ছিপের উপর দাঁড়িয়ে উঠলো, কোষার পানে নজর করে মাথার উপর হাত নাড়লো।

এবার ছিপ এসে ভিড়লো কোষার পাশে।

কোষার পাহারাদার হাঁক দিল—কার ছিপ? তফাত যাও!

বলরাম বললো,—আমাদের কোতোয়ালী ছিপ, হুজুরকে খবর দাও, মহম্মদ খাঁ এসেছে।

পাহারাদার বললো,—হুজুর কাল অনেক রাতে শুয়েছেন, এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি। হুকুরের হুকুম না পেলে কোষায় কোন লোক উঠবে না।

বলরাম বললো,—আমি তাহলে নেমে যাই?

—যাবে, যাও।

পাশে দড়ির সিঁড়ি ছিল। বলরাম সিঁড়ি বেয়ে ছিপে নেমে এলো। মহম্মদ ছিপ সরিয়ে নিল কোষার পাশ থেকে।

বলরাম ছিপের একপাশে বসে পড়লো। মহম্মদ বললো,—তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে, তুমি যে আবার ফিরে আসবে, এ আমি ভাবি নি।

বলরাম বললো,—খাঁ সাহেবকে খবর দিয়েই আমি চলে যেতাম, উনি আমাকে ছাড়লেন না।

মহম্মদ বললো,—তোমাকে পেয়ে ভালো হলো। এবার আমি ডাকাতিয়া নিয়ে সন্দীপে গিয়ে নামবো। ওখানে এখন আর ফিরিঙ্গী হার্মাদ নেই, ইয়াকুব খাঁ আছে। আর আছে যত হার্মাদী লুঠের মাল—হাজার হাজার টাকা, বড় বড় কাঠের সিন্দুকভর্তি টাকা। সেগুলো যদি আমরা আগে সরিয়ে আনতে পারি, তাহলে গন্‌জালিস ফিরে এসে মাথা চাপড়াবে।

ছিপ ঘাটে এসে ভিড়লো। ঘাটের অদূরেই দারোগার তাঁবু। উপরওয়ালা এসেছেন, দারোগা ত্রস্ত। সেই ভোরে উঠে দারোগা নানা ব্যাপারে তদ্বির শুরু করেছে। এখন মহম্মদকে দেখেই বলল,—তুমি এসে গেছ ভালোই হয়েছে, কোষার পাশে অপেক্ষা কর গে। ফৌজদার সাহেব উঠলেই আগে এত্তালা দেবে, তিনি কাল রাতে তোমার খোঁজ করছিলেন।

মহম্মদ বলরামকে নিয়ে আবার ছিপে উঠলো।



॥ তেরো ॥

খাঁ সাহেব অনেক রাতে শুয়েছিলেন, তাঁর উঠতে দেরি হলো। স্নান ও নামাজ শেষ করে খাসকামরায় বসতে বেলা একপ্রহর হয়ে গেল।

তখন মহম্মদের ডাক পড়লো।

মহম্মদের মুখ থেকে খাঁ সাহেব ধীরভাবে সবকিছু শুনে নিলেন। গত রাতেই তিনি সব কিছু স্থির করে রেখেছিলেন। এবার দারোগাদের নির্দেশ দিলেন— সবাই তৈরী হয়ে নাও, দু'দণ্ড পরেই আমরা রওনা হবো।

দারোগারা নিজ-নিজ কোষায় চলে গেল।

বেলা দ্বিতীয় প্রহরে ফৌজদারের কোষার বড় মাস্তুলটার মাথায় লাল নিশান উড়লো, কোষার ছাদের বড় ঢাকটা বেজে উঠলো গুম গুম করে। কোষার নোঙর তোলা হলো, খালাসীরা সাড়া তুললো —আল্লা হো আকবর!

চারিপাশের সলুই ও ছিপ থেকে সেই আওয়াজের প্রতিধ্বনি উঠলো।

এবার পর পর তিনখানি পাল তুলে কোষা অগ্রসর হলো।

পিছনে আরো কোষা।

তারপর সলুই।

তার পিছনে ছিপের সারি।

ডাকাতিয়া ছিল পিছনে সবার আড়ালে, এবার তরতর করে সে এগিয়ে এলো সবার আগে। কালো রঙের সলুইটির সামনের রূপালী সিংহমুখটা দুপুরের রোদে ঝলমল করে উঠলো।

ঘাটে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মনে হলো, মেঘনার বুকে নৌকোর সারি একটা বল্লমের ফলার মতো ত্রিভুজের আকারে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলেছে।

নবাবী নৌবহর ছুটলো সন্দীপের দিকে।



॥ চোদ্দ ॥

আরাকানী নৌবহরের সঙ্গে গনজালিসের লড়াই চলছে।

তিনখানি জাহাজ ঘায়েল হতেই মেংরাজগী পিছু হটতে শুরু করেছে। বোম্বেটে জাহাজগুলি কামান দাগতে দাগতে এগিয়ে চলেছে।

আরাকানী বহর একেবারে সরে পড়ে নি, তারা রীতিমতো শত্রু পক্ষের গোলার জবাব দিয়ে যাচ্ছে। নদীর বুকে তারা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে বোম্বেটেরা তাদের আর কোন জাহাজকে কায়দা করতে পারছে না। কামানের গোলার নাগালে পেলেও, গোলা সবই জলে পড়ছে। আবার ছড়ানো আরাকানী বহর পিছন দিকে না এসে পড়ে, সে দিকেও নজর রাখতে হচ্ছে। লড়াই তাই ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত নদী জুড়ে।

এই ধরনের লড়াই শেষ হতে সময় লাগে।

দিন শেষ হয়ে এলো। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। আরাকানীরা তাদের কোন জাহাজেই আলো জ্বাললো না। পর্তুগীজরা নিজেদের নজর ঠিক রাখার জন্য নিজেদের প্রতিটি জাহাজের মাস্তুলে একটা করে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিলে। কিন্তু মুশকিল হলো এই অন্ধকারে নদীর বুকে আরাকানী জাহাজ তারা তাগ্ করবে কেমন করে?

কিন্তু এখন পিছিয়ে এলে আরাকানীরা তো আবার এগিয়ে আসবে! গন্জালিস সেইখানেই রুখে গেল।

সন্ধ্যার খানিক পরে চাঁদ উঠলো। তখন হার্মাদদের সুবিধা হলো। রাতের অন্ধকারে ঘোরাফেরা তাদের অভ্যাস আছে, আরাকানী জাহাজগুলোকে তারা এবার নজরে পেল, আবার লড়াই জমে উঠলো। দিনে শুধু জলের উচ্ছ্বাস দেখা গেছে, রাতে জ্বলন্ত

গোলাটাই আগাগোড়া দেখা যায়। গোলা ছুটছে, পড়ছে, ফাটছে, আগুনের ঝিলিক স্পষ্ট চোখে পড়ছে। দিনের চেয়ে রাতের লড়াই দেখায় ভালো—জমে ভালো।

সারা রাত দু'পক্ষের গোলা বর্ষণ চলে।

ভোর বেলায় লড়াই চলে এলো চট্টগ্রামের উপকূলে।

আরাকানী বহর কিন্তু চট্টগ্রামে ভিড়লো না। আরও পিছিয়ে চললো।

ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদের তখন জিদ চেপে গেছে। সারারাতে আর একখানিও শত্রুজাহাজ তারা ঘায়েল করতে পারে নি। গন্‌জালিস বললো,—কোথায় যায় ওরা দেখে, ফেরার পথে চট্টগ্রাম লুঠে নিয়ে যাবো।

এবার আরাকানী বহর কর্ণফুলি নদীর মোহানায় এসে পড়লো। একে একে সব জাহাজ ঢুকে পড়লো নদীর ভিতরে।

গন্‌জালিস তখন উদ্ধত হয়ে উঠেছে। বললো,—ভালোই হলো, এবার এই ছোট নদীর ভিতরে ঢুকেই ওদের মারবো। আজ ওদের বহর খতম না করে ফিরছি না।

কয়েকখানি বোম্বেটে জাহাজ ঢুকে পড়লো কর্ণফুলির ভিতরে।

কিন্তু গন্‌জালিসের হিসাবে ভুল হয়েছিল। জয়ের উৎসাহে উদ্ধত বোম্বেটে ক্যাপ্টেন অগ্র-পশ্চাৎ বিচার করে নি।

মগ ফৌজদার মেংরাজগী বুদ্ধিহীন মানুষ নয়। দশ-বারোখানা বোম্বেটে জাহাজ যখন কর্ণফুলিতে ঢুকেছে, তখন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে একঝাঁক সালতি বেরিয়ে এলো। এক-একটি সালতির উপর এক-একটি ছোট কামান আর আট-দশ জন করে বন্দুকধারী বরকন্দাজ। সালতির সামনের দিকটা লোহার পাত দিয়ে ঘেরা। পাতের গায় ছোট-ছোট ফুটো। এক ফুটোয় চোখ রেখে আরেক ফুটোয় বন্দুকের নল বের করে বন্দুকধারী বরকন্দাজরা বসে আছে।

আট-দশখানি করে সালতি এসে এক-একটি বোম্বেটে জাহাজের পিছন দিকে ঘিরে ধরলো। বোম্বেটে জাহাজের কামান সামনে

চলে, পাশে চলে, কিন্তু পিছনে চলে না। সালতিকে রোখার জন্যে বোম্বেটে জাহাজকে ঘুরে দাঁড়াতে হলো। কিন্তু কামান দেগে ইতস্ততঃ ছড়ানো ছোট ছোট সালতিগুলিকে কায়দা করা গেল না। আরাকানীরা বেপরোয়া কাছে এসে গুলি চালাতে লাগলো। বোম্বেটে জাহাজের ছাদে দাঁড়িয়ে যারা কামান দাগছিল, সালতির গুলি খেয়ে তারা কেউ কেউ ঘুরে পড়লো।

বোম্বেটেদের সব গোলাই অবশ্য ব্যর্থ হলো না। কাছাকাছি গোলা ফেটে জলোচ্ছ্বাসে কোন কোন সালতি উলটে পড়লো, আরাকানীরা জলে পড়লো। কিন্তু হালকা সালতিকে তখনই তারা সোজা করে নিলে। তাদের কামানগুলো সালতির পাটাতনে গজাল দিয়ে আটকানো, সালতি উলটে গেলেও কামান ঠিক থাকে। গোলা সালতির এক-একটা খোপে টাইট করে আটকানো। সালতি উলটে গেলেও কোন গোলা খোয়া যায় না। শুধু বারুদ নষ্ট হয়। উলটে যাওয়া সালতি সোজা করে নিয়ে, জল ছেচে বের করে দিয়ে মগেরা সালতি ফিরিয়ে নিয়ে যায় চট্টগ্রামে।

বোম্বেটেরা গোলা-গুলি খরচ করে, কিন্তু শত্রুপক্ষকে কায়দা করতে পারে না। এদিকে গোলা-গুলি তো আর অফুরন্ত নয়।

এবার গন্‌জালিস বিপদ বুঝলো। নির্দেশ দিল—আর নয়, গোলা-গুলি শেষ হয়ে যাবার আগেই সবাই বাহির-দরিয়ায় বেরিয়ে পড়ো।

বিউগ্‌ল্ বাজিয়ে জাহাজ থেকে নির্দেশ ঘোষণা করা হলো।

কর্ণফুলির ভিতরে যারা ঢুকেছিল, তারাও বিউগ্‌ল্ শুনলো। কিন্তু বেরুবার পথ কই? চারিপাশে শুধু সালতি আর সালতি। এত দিন তারা নিরীহ জনপদ লুঠ করে বিনা বাধায় ফিরেছে, কিন্তু এখন তো আগু-পিছু সশস্ত্র শত্রু!

যারা ছোট নদীটার ভিতর ঢোকে নি, তারা এবার বেপরোয়া গোলা ছুঁড়ে বাহির-দরিয়ায় চলে এলো। গন্‌জালিসের জাহাজ এলো সবার আগে।

কর্ণফুলির ভিতর থেকে একখানিও বোম্বেটে জাহাজ ফিরলো না।

এদিকে আরাকান উপকূলের পাহাড়ী ঘাঁটি থেকে মাঝে মাঝে গোলা এসে পড়তে লাগলো।

আরেক দিকে উপকূল এলাকায় ইতস্ততঃ ছড়ানো অজস্র সালতি, তারাও এলোমেলো কামান দাগছে।

গন্‌জালিসকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে হলো মাঝদরিয়ায়। পিছনে যারা রইল, তাদের জন্য আর পিছিয়ে যাওয়া চললো না।

গন্‌জালিস ফিরতে বাধ্য হলো।

কিন্তু যত সহজে ফিরে আসবে ভেবেছিল, তা আর হলো না।

॥ পনেরো ॥



বেলা দুপুর পার হয়ে গেছে। সূর্য মাথার উপর থেকে সরে গেছে পশ্চিমের আকাশে। মেঘনার জল ঘন নীল হয়ে উঠেছে, তারই উপর রূপালী রোদের ঝলমলানি চোখ ঠিকরে দেয়। বোম্বেটে জাহাজগুলি পশ্চিমমুখো ফিরছে। গন্‌জালিস মাঝে মাঝে কপালে হাত দিয়ে পূর্ব দিকে নজর করছে, কর্ণফুলি থেকে কোন জাহাজ বেরিয়ে এলো কি?

বড় মাস্তুলটার মাথায় একজন বসে আছে ওদিকে নজর রাখার জন্য।

একসময় গন্‌জালিসের নজরে পড়লো, পশ্চিমের দিকসীমায় কয়েকটা কালো বিন্দু ফুটে উঠেছে। —ওগুলো কী?

তখনই সে হাঁক দিল—নজরওয়ালা হো, পশ্চিমে নজর কর!

মাস্তুলের আগায় বসে থাকা লোকটি এবার ধীরে ধীরে ঘুরে বসলো। কপালে হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে সে ঠাহর করতে লাগলো। বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল। তারপর সে সাড়া দিল—ক্যাপ্টেন হো! নৌবহর!

—ফৌজী, না, সদাগরী?—ক্যাপ্টেন হাঁক দিল।

—নজর নেই !—উপর থেকে সাড়া এলো।

আরো কয়েক মিনিট গেল, তারপর আবার উপর থেকে হাঁক এলো—ক্যাপ্টেন হো, ফৌজী বহর, লাল নিশান, নবাবী ফৌজ।

—গুনতি কর।

আরো কয়েক মিনিট পরে আবার সাড়া এলো—দশখানা কোষা, পিছনে সালতি,—বিশ, তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, আরো আছে।

—ঠিক আছে, নজর রাখো।

গন্‌জালিসের মুখে চিন্তার ছায়া পড়লো। নবাবী নৌবহরের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই বাধলে পরাজয় অনিবার্য। বেশীক্ষণ লড়াই চালাবার মতো যথেষ্ট গুলি-বারুদ কোন জাহাজেই নেই। কিন্তু সন্দীপে পৌছাতে হলে এই নবাবী বহরের সম্মুখীন হতেই হবে।

কয়েক বছর ধরে লুঠতরাজ-ডাকাতি করার ফলে গন্‌জালিসের মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কোন বিষয়ে বেশীক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করার মতো ধীরতা তার ছিল না। একজন অনুচরকে সে বললো,—ক্যাপ্টেন রডারিককে খবর দাও।

পিছনের জাহাজেই রডারিক ছিল। এই জাহাজ থেকে পতাকা দেখিয়ে ইশারা করা হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে পিছনের জাহাজ এসে ভিড়লো এই জাহাজের গায়ে। রডারিক এক জাহাজের ছাদ থেকে আরেক জাহাজের ছাদে চলে এলো।

গন্‌জালিস রডারিককে বললো,—সামনে নবাবী বহর দেখা দিয়েছে।

রডারিক বললো,—দেখেছি।

—ওরা সম্ভবতঃ সন্দীপ দখল করে এগিয়ে আসছে।

—তাই মনে হয়, সেই দিক থেকেই যখন আসছে।

—ওদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই হলে আমরা হেরে যাবো, আমাদের রসদ তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমরা ওদের সঙ্গে মুখোমুখি আর লড়বো না। অনর্থক লোকক্ষয় করে, জাহাজ নষ্ট করে শক্তিক্ষয় করতে আমি চাই না।

—মুখোমুখি লড়াই করতে তো আমরা এদেশে আসি নি। আমরা তো সোনা-রূপা লুঠতে এসেছি। লুঠ করবো আর সরে পড়বো। আমরা মুখোমুখি লড়াই করবো কেন? মুখোমুখি লড়তে গিয়েই তো আজ আমরা আরাকানে মার খেলাম।

—আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। আর লড়াইয়ের ঝামেলায় আমি যাবো না। তুমি সমস্ত নৌবহর নিয়ে দক্ষিণে বাহির-দরিয়ায় বেরিয়ে যাও, মাদ্রাজ হয়ে তুমি কোচিন চলে যাও। সেখানে কোন অসুবিধা দেখলে গোয়া চলে যাবে। আমরাও চলে যাচ্ছি। নবাবী বহর বেশী দূর অনুসরণ করবে না, লড়াই হবে না। আমি একদিন পরে তোমাদের পিছনে যাবো।

—আপনি বুঝি একবার সন্দীপ হয়ে যাবেন?

—হ্যাঁ। রাত্রির অন্ধকারে আমি সন্দীপে গিয়ে নামবো। ওখানে যে সোনাদানাগুলো রেখেছি, সেগুলো নিয়ে আসতে হবে।

—সেটা না হলে এতদিনের মেহনতই তো মাঠে মারা যাবে।

—নবাবী নৌবহর আরো কাছে এসে গেছে, তুমি আর দেরী কোরো না। যাও। কোচিন বা গোয়ায় আবার দেখা হবে।

রডারিক গন্‌জালিসকে অভিবাদন জানিয়ে নিজের জাহাজে ফিরে গেল।

গন্‌জালিসের জাহাজের বড় মাস্তুলের মাথা থেকে বড় কালো বোম্বেটে-মার্কা নিশানটা নেমে এলো। সেই নিশান উড়লো রডারিকের জাহাজে। রডারিকের জাহাজ দূরে সরে গেল।

পিছনে বোম্বেটে বহরের বাকি জাহাজগুলি সেই নিশানের নিশানা দেখে রডারিকের জাহাজের অনুসরণ করলো।

॥ ষোলো ॥



রডারিক যত সহজে নবাবী বহরকে বাহির-দরিয়ায় টেনে নিয়ে যাবে বলে মনে করেছিল, তা হলো না।

রডারিক কিছুটা কাছাকাছি হয়ে মুখোমুখি কয়েকটা গোলা ছুঁড়লো। অবশ্য সে গোলার নাগালের মধ্যে নবাবী বহর ছিল না। ইব্রাহিম খাঁ কোষার ছাদেই ছিল, বোম্বেটে জাহাজের আস্ফালন দেখে হাসলো। গোলন্দাজ-নায়ক রহমন খাঁ এসে বললো,—হুজুর, জবাব দেবো?

ফৌজদার বললেন,—মিছিমিছি গোলা নষ্ট করে কি হবে? ওদের গোলাও এত দূর আসবে না, আমাদের গোলাও অত দূর পৌঁছোবে না। চুপ করে দেখই না!

রডারিক খানিক অপেক্ষা করলো, কিন্তু নবাবী ফৌজ তেড়ে গেল না। রডারিক তখন দক্ষিণমুখো পাড়ি জমালো।

ফৌজদারের কোষার পাকা-পোক্ত মাঝিরা পাল গুটিয়ে নিয়ে কয়েক মিনিট চুপচাপ প্রায় থমকে রইল। বোম্বেটে বহর ধীরে ধীরে দূরে চলে গেল।

এবার প্রবীণ মাল্লা রহিম সর্দার বললো,—হুজুর, পশ্চিমে একবার নজর করুন, ঝড় উঠবে।

ইব্রাহিম খাঁ সেদিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে বললেন,—ফিরে চল, ঝড়ের আগে সন্দীপে ফিরতে হবে।

রহিম সর্দার আবার পাল তুলে দিল। নবাবী বহরের সব কয়টি নৌকাই এবার সন্দীপের দিকে চললো।

পশ্চিমের মেঘ ধীরে ধীরে আকাশে এগিয়ে এলো, বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা দিল। ঝড়ো হাওয়ার ঝাপ্‌টা নৌকা কাঁপিয়ে তুললো। সেই বাতাসের বেগে পালতোলা নৌকাগুলি দ্বিগুণ বেগে ছুটলো সন্দীপের দিকে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্দীপের সীমানা দেখা গেল।

রহিম বললো,—হুজুর, হাওয়া পুবমুখো। এদিকে কোষা ভেড়ালে বেশী ঝড় হলে চড়ায় উলটে যাবে। কোষা উত্তরে নিয়ে যাই।

রহিম সব কটা পাল নামিয়ে কোষায় মুখ ফেরালো উত্তর-দিকে। তিরিশখানা দাঁড়ের টানে কোষা সন্দীপের উত্তরে চললো।

উত্তরে ঘন গাছপালার জঙ্গলের আড়ালে একটা খাঁড়ির মতো নজরে এলো, রহিম সর্দার সেইখানে কোষা ঢুকিয়ে দিলে।

পর পর অন্যান্য কোষা, সলুই ও ছিপ এসে ঢুকলো সেইখানে।

এই সময় সূর্য অস্ত গেল। আকাশ আগে থেকেই অন্ধকার হয়ে ছিল, এখন অন্ধকার আরো ঘন হলো। এবার বাতাসের বেগ বাড়লো। রীতিমতো ঝড় উঠলো।

রডারিক তখন মাঝ-দরিয়ায় ঝড়ের মাঝে পড়েছে। সেও পাকা নাবিক, সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী পার হয়ে ভারতে এসেছে। সাগরের জল-ঝড়ের সঙ্গে তার লড়াই শুরু হলো।

বঙ্গোপসাগরের ঝড়-তুফানের অখ্যাতি আছে। পাকা-পাকা মাঝিরা মেঘনার মোহনাকে ঝড়ের সময় ভয় করে। ঝড়ের মাঝে এখানে অনেক সময় নতুন-নতুন সাময়িক ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয়, তার পাকে পড়লে আর রক্ষা নেই! অন্ধকারে তুফানের দাপটে সে ঘূর্ণী নজরে আসে না, নজরে এলেও সব সময় সামাল দেওয়া যায় না। ছোট ছোট ডিঙি-পানশী যদি বা কোনমতে ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে, জাহাজের সে অবকাশ নেই।

সেদিনকার সেই ঝড়ে রডারিক আর তার অনুগামী বোম্বেটে বহর মেঘনার মোহনায় হারিয়ে গেল। সাগরের জল আর আকাশের বাতাস সেদিন সন্ধ্যায় বঙ্গবাসীকে একদল বিদেশী অনাচারীর সন্ত্রাস থেকে মুক্তি দিল।

সেই সাইক্লোন থামলো প্রায় এক ঘণ্টা পরে।

একপশলা বৃষ্টি হয়ে আকাশ মেঘমুক্ত হলো আরো পরে। চাঁদও উঠলো। সেই জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির পানে তাকালে তখন আর মনে হয় না যে, একটু আগে প্রকৃতি অমন রুদ্র হয়ে উঠেছিল!

॥ সতেরো ॥



গন্‌জালিস পাকা নাবিক, ঝড়ের মধ্যেই অনেক চেষ্টা করে সে সন্দীপে জাহাজ ভেড়ালো। অবশ্য ঠিক ঘাটে ভিড়তে পারলো না, ঝড়ের দাপটে চড়ায় আটকে জাহাজ কাত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

দাঁড়ী-মাঝি দুদিকে ছুটে। নোঙর ফেললো আর বড় বড় বাঁশ ঠেকা দিল চড়ার উপর। তবু জাহাজ এলোমেলোভাবে টলতে লাগলো।

ঘণ্টাখানেক বাতাসের সঙ্গে লড়াই করে সবাই ঘর্মাক্ত, তখন ঝড় থামলো। বৃষ্টি শুরু হলো।

বৃষ্টির মধ্যেই ডিঙি নিয়ে গন্‌জালিস ঘাটে এসে উঠলো। সঙ্গীদের নিয়ে সে অগ্রসর হলো জলার দিকে।

ঝিলের কাছে যখন তারা পেঁছালো, তখন চাঁদ উঠেছে।

এই দিকটা গন্‌জালিসের কাছে খুবই পরিচিত।

গাছতলায় টাকার স্তূপের সামনে এসে সে দাঁড়ালো। বললো, এগুলো নিয়ে যাবার অনেক অসুবিধা, এর ব্যবস্থা সবশেষে হবে। আগে সিন্দুকগুলো একটা একটা করে নিয়ে যাই।

বলে একটু এগিয়ে একটা গাছের নীচে এসে দাঁড়ালো সে, বুট ঘষে ঘষে ঘাসের নীচে থেকে একটা শিকল বের করলে, সঙ্গীদের বললো,—চার-পাঁচজনে হাত লাগাও। জলে সিন্দুক ডোবানো আছে।

পাঁচ জনে শিকল টানতে শুরু করলো।

জলার পাঁকে ভারী সিন্দুক বসে যাবার কথা, কিন্তু বড় বড় ঝাঁঝি সিন্দুককে পাঁকে বসতে দেয় নি, ঝাঁঝির উপর দিয়ে সরসর করে সিন্দুকটা কিনারায় উঠে এলো। গন্‌জালিস বললো,—একেবারে নদীর কিনারায় নিয়ে যাও।

বোম্বেটেরা গড়িয়ে গড়িয়ে সিন্দুক নিয়ে চললো নদীর কিনারায়।

গন্‌জালিস ইতিমধ্যে আরেক গাছতলার নীচে আরেকটি শিকল বের করে অন্যান্য সঙ্গীদের বললো,—হাত লাগাও।

সেই সিন্দুক নদীর ঘাটে নিয়ে যেতে যেতে আগের দল ফিরে এলো। গন্‌জালিস তাদেরকে তৃতীয় সিন্দুকের হদিস দিল।

এইভাবে পর পর চারটি সিন্দুক উঠলো। চারটি সিন্দুক এসে পেঁছালো নদীর ঘাটে।

গন্‌জালিস ঘাটে এলো। বললো,—এক একটা সিন্দুক এবার জাহাজে তোলো।

ডিঙিতে সেই সিন্দুক এক-একটা ওঠানো সহজ নয়, কিন্তু বোম্বেটেরা নীরবে এই সব কাজ করতে অভ্যস্ত। ঠিক মতো ডিঙিতে সিন্দুক তুলে নিয়ে তারা জাহাজে গিয়ে উঠলো।

চার দফায় চারটি সিন্দুক জাহাজে উঠলো।

ইতিমধ্যে জাহাজ থেকে কয়েকটি থলি তারা এনেছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে কয়েকজন গাছের নীচে পড়ে থাকা টাকা কুড়িয়ে থলি ভর্তি করলো। সব থলিগুলি ভরেও অনেক টাকা পড়ে রইল। গন্‌জালিস বললো,—যা পড়ে রইল, থাক্‌গে। আর দেরী করা চলবে না, ভোরের আগেই মেঘনা থেকে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে। জল্‌দি করো।

এবার খোসমেজাজে সবাই ডিঙিতে এসে উঠলো।

তারপর জাহাজে।

খোসমেজাজে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে গন্‌জালিস ছাদে উঠে এলো। পিছনে দশজন অনুচর। টাকার থলিগুলো এবার দড়ি বেঁধে তুলতে হবে।

কিন্তু ছাদে লোক কই? আর সবাই গেল কোথায়? গন্‌জালিস হাঁক দিল—হেই! হো!

কোন সাড়া নেই।

—হেই! হো!

মাস্তুলগুলোর নীচে পাল আর ত্রিপল জড়ো করা ছিল, মুহূর্তে তার আড়াল থেকে উঠে দাঁড়ালো বন্দুক হাতে দুটি লোক—মহম্মদ আর ইয়াকুব।

গন্‌জালিস চমকে উঠলো।

ইয়াকুব বললো,—সেলাম হার্মাদ সাহেব, বান্দা হাজির।

গন্‌জালিস কোমরে হাত দিল, তলোয়ার নেই, শুধু ছোরাখানা আছে। সঙ্গের অনুচরদের পানে তাকালো সে, তাদের প্রত্যেকের পিঠের উপর এক-একটি বল্লম ধরে আছে এক একজন বরকন্দাজ।

মহম্মদ ক্যাপ্টেনের মনের কথা বুঝতে পেরে বললো,—কোন ভরসা নেই সাহেব, তোমার লোকজনদের আমরা আগেই আটক করেছি। শুধু তোমার জন্যই বসে ছিলাম।

ইয়াকুব হাঁক দিল—পালানোর চেষ্টা করলেই খতম।

—তাই নাকি!—প্রচণ্ড এক ধমকের সুরে গন্‌জালিস বলে উঠলো। সবাই চমকে গেল। পরক্ষণেই সে ছিট্‌কে গেল ছাদের কিনারায়, মুহূর্তমধ্যে রেলিং টপ্‌কে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে।

ইয়াকুব ও মহম্মদ ছুটে এলো রেলিংয়ের ধারে। গন্‌জালিস ভেসে উঠতেই তারা গুলি চালালো।

গনজালিস তৎক্ষণাৎ আবার ডুবলো, ভেসে উঠলো অনেকখানি তফাতে। কিন্তু সেযুগের গাদা-বন্দুকে এত তাড়াতাড়ি গুলি চালানো যায় না।

আবার বন্দুকে গুলি ভরে নিতে নিতে গন্‌জালিস সাঁতরে আরো দূরে চলে গেল। ইয়াকুব ও মহম্মদ আবার গুলি চালালো। কিন্তু গুলি লেগেছে বলে মনে হলো না। এই সময় জাহাজের আড়াল থেকে একখানি ছিপ সামনে এলো। ছিপের উপর বসে ছিল একা বলরাম। ইয়াকুব হাঁক দিল—পাকড়াও, পাকড়াও! সামনে দুষমন—

বলরাম হাত তুলে বললো—যেতে দাও। এই হাঙর-কুমীরের আস্তানা ছাড়িয়ে ও কোথায় কত দূর যাবে যাক্ না?

গন্‌জালিসের কালো মাথাটা তখনও চাঁদের আলোয় দূরে দেখা যাচ্ছে।



॥ আঠারো ॥

সেই রাত্রে সেই মেঘনার জলে দুর্দান্ত পর্তুগীজ বোম্বেটে সর্দার ক্যাপ্টেন গন্‌জালিস চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল।

সকালে জাহাজ-বোঝাই লুঠের টাকা আর কুড়িজন বোম্বেটে বন্দী নিয়ে মহম্মদ, ইয়াকুব ও বলরাম ফিরে এলো সন্দীপে ফৌজদার ইব্রাহিম খাঁর দরবারে।

ইয়াকুব ও মহম্মদকে সন্দীপ ও হাতিয়ার কর্তৃত্ব দিয়ে ইব্রাহিম খাঁ ঢাকায় ফিরলেন। বলরাম ফিরে গেল তাঁর সঙ্গে। নবাবী সেরেস্তা থেকে বলরামকে বার্ষিক ভাতা দেবার ব্যবস্থা হলো। ইব্রাহিম খাঁ বলরামকে উপহার দিলেন একখানি ময়ূরপঙ্খী নাও। সেই নৌকোয় চড়ে বলরাম পদ্মা ও ধলেশ্বরীর ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়াতো সর্পাঘাতের চিকিৎসা করে। বলরাম ওঝা সে যুগের সে অঞ্চলের সর্বজনের শ্রদ্ধেয় একটি নাম।